এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

গাজীউল হক

পরিবেশক :
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং
প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহীদ
বরকত-কে স্মরণ করি

কথা প্রসংগে

দেশ বিভাগ হলো। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের মানুষ চেয়েছিলো শোষণের অবসান; চেয়েছিলো ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক পুনর্বিন্যাস। কিন্তু তা হলো না। বাংলাদেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অসংগতির পূর্ণ সুযোগ নিলো পশ্চিম পাকিস্তানের বিত্তশালী নবাব, জায়গীরদার, জমিদার, এবং ব্যবসায়িগণ। এঁদের সংগে যোগ দিলেন ভারত থেকে আগত মুসলমান বিত্তশালী ব্যবসায়ী-শ্রেণী। ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত কারণে এই সব অবাংগালী বাস্তুহারাগণ (যাঁরা পাকিস্তানের জন্মের তেইশ বছর পরও কাগজে কলমে এবং মানসিকতার দিক থেকে বাস্তুহারাই রয়ে গেছেন, যদিও পাকিস্তানের বাস্তুভিটের প্রায় সবটুকুই তাঁদের দখলে, পাকিস্তানী হতে পারেন নি) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংগেই আত্মিক নৈকট্য অনুভব করলেন। পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টায় অবশ্য, এদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে, কিন্তু বাংলাদেশকে বঞ্চনা এবং লুণ্ঠন করার ষড়যন্ত্রে এঁরা পরস্পরের সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ ছিলো এঁদের শোষণের ক্ষেত্র এবং বাংলাদেশের মানুষ ছিলো এদের লুণ্ঠনের শিকার। এই লুণ্ঠনকে অব্যাহত রাখতে এঁরা সাধারণতঃ তিনটি হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন: (১) ধর্মীয় জিগীর, (২) সাম্প্রদায়িকতা, এবং (৩) ভারত বিদ্বেষ। এই তিনটি হাতিয়ারই মূলতঃ একই হাতিয়ার থেকে উৎপন্ন, তা হলো সাম্প্রদায়িকতা।

এই কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ অংগে মেখেই পাকিস্তানের জন্ম। সুতরাং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধিবাসীদের অন্য ধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে পাকিস্তানের হিন্দু নাগরিকদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে রাখা অতি সহজ ছিলো। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানের ধুরন্ধর শাসকশ্রেণী সেই ধিকৃত কৌশলের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন নি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারণাও মূলতঃ সাম্প্রদায়িকতা ব্যাধি থেকে উদ্ভূত। শাসকশ্রেণী কর্তৃক সব সময়ে পাকিস্তানের অধিবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পাকিস্তান মুসলমানের রাষ্ট্র, পক্ষান্তরে ভারত হিন্দুদের আবাসভূমি এবং ভারত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে সদা প্রয়াসী। যখনই বাংলাদেশের মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে,

তখনই সমস্ত সরকারী প্রচারযন্ত্র থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, এই সব-কিছু হিন্দুদের ধ্বংসাত্মক কার্য এবং ভারত ও ভারতীয় অনুচরদের ষড়যন্ত্র। যখনই বাংলার মানুষ তাদের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তখনই সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানী শাসকচক্র কর্তৃক ভারতের দালাল—এই আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, জনদরদী নেতা মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং বংগবন্ধু শেখ মুজিব প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে এই আখ্যাই লাভ করেছেন।

কিন্তু কোনো ষড়যন্ত্র, কোনো প্রচারণাই ইতিহাসের গতিশীল চাকাকে গতিহীন করতে পারে না। ধর্মীয় জিগীর, সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারত-বিদ্বেষের প্রচারণা প্রথম দিকে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কার্যকরী হলেও পরবর্তীকালে এই হাতিয়ারের বহুল ব্যবহারের ফলে এর গুরুত্ব হারিয়ে ফেললো, বাংলার মানুষের চোখের সম্মুখে বঞ্চনা এবং লুণ্ঠনের রূপটি যতই স্পষ্টরূপে ধরা পড়তে শুরু করলে, ততই তাদের মোহমুক্তি ঘটতে লাগলো, স্পষ্টতর হতে লাগলো পাকিস্তানী শাসকচক্রের চক্রান্ত এবং চক্রান্তের স্ট্রাটেজী মিথ্যে প্রচারণার কারসাজি। যেদিন বাংলার মানুষ বুঝলো ধর্মীয় ঐক্যের নামে চলছে বঞ্চনার ব্যবসা, ভারত বিদ্বেষ প্রচারের মূলে রয়েছে অবাধ শোষণ নির্বিঘ্ন রাখার প্রচেষ্টা, সাম্প্রদায়িক প্রচারণার আড়ালে লুকিয়ে আছে লুণ্ঠকের বীভৎস মুখ, সেদিন বাংলার মানুষ তার মোহমুক্ত মন নিয়ে মাঠে নেমে এলো, বিদ্রোহ করলো লুণ্ঠন এবং শোষণের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের প্রথম স্ফুরণ হলো বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে। শাসকচক্র বাংলার মানুষকে তার ভাষা, সংস্কৃতিরূপ তীক্ষ্ণ হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ চালালো। বাংলাদেশের বঞ্চিত ও শোষিত মানুষ এবার সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীতে রক্তে লেখা হলো এক নোতুন ইতিহাস। ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি আত্মবিস্মৃত জাতি তার আত্ম-পরিচয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলো, মিথ্যের কুহেলী জাল ভেদ করে প্রভাতী সূর্যের আলোয় তার চেতনার উন্মেষ হলো। বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হলো উনিশ শ' বায়ান্নর মহান একুশে ফেব্রুয়ারীতে।

পাকিস্তানের সাড়ে তেইশ বছরের ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত প্রভু এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা বাংলা দেশকে বঞ্চনার এবং শোষণের

ইতিহাস। এঁদের শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বার বার পট পরিবর্তন হযেছে, শাসকদের অদলবদল হয়েছে। অবশেষে, সামবিক শাসনের আমদানী হযেছে। কিন্তু ক্ষমতার আসনের কোনো ,পরিবর্তনই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে প্রতারিত করতে পারেনি। বাংলার মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। সেই প্রতিবোধেব সংগ্রাম আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত। পঁচিশে মার্চের গভীর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালানোব পর থেকে বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তি-যুদ্ধে লিপ্ত। বাংলাদেশেব এই মুক্তি-যুদ্ধ বাংগালীদের আবেগের আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ নয়, এই মুক্তি-যুদ্ধ বাংলাদেশেব মানুষের ন্যায়সংগত অধিকারের দাবীতে সাড়ে তেইশ বছবেব প্রতিটি সংগ্রামের ক্রম-পরিণতি। সুতরাং বাংলার মুক্তি-যুদ্ধেব কাবণ জানতে হলে. জানতে হবে বাংলাদেশের সাড়ে তেইশ বছরেব কঠিন সংগ্রামেব ইতিহাস।

বাংলাদেশেব প্রতিটি সংগ্রামে জড়িত থেকে, প্রতিটি সংগ্রামের গতি-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করাব সুযোগ আমার ঘটেছে। সংগ্রামের দিনগুলো স্মরণ করতে গেলেই মনেব পর্দায ভিড করে আসে অনেকগুলো মুখ,—বরকত, আসাদ, তারিক. মাসুদ, টিটু, আজাদ, কবিম হাওয়ালদার, আরো আরো অনেকের। বরকত, মধুর রেস্তোবার টিনেব চালা ছুঁই-ছুঁই ছিলো যার মাথা, ময়লা শ্যামবর্ণের শান্ত ছেলেটি। সেদিন বায়ান্নর একুশে ফেব্রুযারীতে কী এক অসহ্য আবেগে ছুটে গিয়েছিলো। তারপর একটা বুলেটের আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের সামনে।

আসাদ, প্রাণে ভরপুর একহারা ছেলেটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র। কৃষক আন্দোলনের ডাকে আইন পড়া ছেড়ে দিয়েছিলো। উনিশ শ' সত্তরের বিশে জানুয়ারী। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে পেছনে। জ্বরতপ্ত দেহ নিয়ে ছুটে এসেছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সশস্ত্র বাহিনী ঘিরে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নির্বীর্য নিষ্ক্রিয়তা সইতে পারলো না আসাদ, ঝাঁপিয়ে পড়লো, —তারপর নিজের প্রাণটুকু দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামে উদ্দাম প্রাণের বন্যা এনে দিলো।

তারিক, মামুদ, টিটু, আজাদ,—ছোট ছোট তাজা প্রাণ, দেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান। ভাংগা বন্দুক, টু-টু বোর রাইফেল নিয়ে রুখতে গিয়েছিলো

পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার দস্যুদের। মর্টারের গোলায় কিশোর তারিকের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো মাসুদ, টিটু, আজাদের কচি দেহগুলো।

শুধু এরা নয়, বাংলাদেশের অগণিত মানুষ বুকের রক্তে স্বাধীন বাংলার ইতিহাস লিখে গেছেন এবং লিখে যাচ্ছেন। এই বইয়ের স্বল্প পরিসরে তাদের চির-অম্লান কীর্তিকাহিনীর উল্লেখ সম্ভব নয়। যদি কোনো দিন সুযোগ আসে, তবে সেদিন কালির আঁচড়ে তাঁদের ছবি আঁকবার স্পর্ধা রইলো।

একটা বেদনাসিক্ত বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে এ বই লেখা আরম্ভ করি। বাংলা দেশের ওপর যে অবর্ণনীয় দুর্যোগের ঝড় বইছে, তার প্রচণ্ড ধাক্কা জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ঘটনার সংগে সম্পৃক্ত থাকার জন্যে এ বইয়ের কোথাও হয়তো আবেগের প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু তার জন্যে কোন ঘটনা বিকৃত আকারে পরিবেশিত হয়নি। ভুল তথ্য এ বইয়ে সন্নিবেশিত করিনি। সত্যকে সত্য বলবার এবং মিথ্যেকে মিথ্যে বলবার চেষ্টা করেছি। অহেতুক কারো নিন্দে যেমন করিনি, তেমনি অহেতুক কারো প্রশংসাও করিনি। যার যা প্রাপ্য তাকে তা-ই দিতে চেষ্টা করেছি।

শেষটুকু বলি। শ্রদ্ধেয় শ্রীত্রিদিবেশ বসু (কাকাবাবু) এবং সুসাহিত্যিক পরেশদা'র সাহায্য না পেলে বইটি ছাপার অক্ষরে বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধের অকৃত্রিম সুহৃদদের হাতে তুলে দিতে পারতুম না। আর একজনের কথা বলা হলো না। কারণ, বলা চলে না। শুধু বলি, এ বইয়ের সবটুকু তারই প্রেরণার দান।

গাজীউল হক

প্রারম্ভিক

কটিতটে তার সাগর মেখলা, আকটি কণ্ঠে দোলানো পদ্মা, যমুনা, মেঘনার মালা, শ্যামলে শ্যামল তার দেহ, অংগে ঢলঢল কাঁচা লাবণি, ভোরের প্রথম আলোর মতো কোমল। শিশির-ভেজা মাটিতে তার প্রথম প্রেমের মধুর স্পর্শ; ধানের শীষে আর দূর্বাঘাসে জড়ানো ভালোবাসা সে আমার সোনার বাংলা।

বাংলা—সোনার বাংলা; মাটিতে তার সোনা ফলে। আর তারই জন্যে বাংলার দুয়ারে বার বার হানা দিয়েছে দস্যুর দল। ছিন্ন-ভিন্ন করেছে তার শ্যামলী দেহ। নখরে নখরে খণ্ডিত ক'রে ঝলকে ঝলকে করেছে রক্ত পান। আর প্রতিবার বাংলা তার সবটুকু শক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ—নিঃশঙ্ক চিত্তে। "আঁফাঁ তেরিব্‌ল্‌"—নিঃশঙ্ক দুরন্ত বিদ্রোহী। কোমলতার অবগুণ্ঠন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শক্তির সাধনা করেছে। বিদ্যুতের তীব্রদাহ নিয়ে প্রত্যাঘাত করেছে; শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবিলা করেছে নিঃশঙ্ক দুরন্ত বিদ্রোহী বাংলাদেশ।

সে আদিম যুগে বাংলার আদিবাসীরা আর্যদের রুখেছে। প্রতিরোধে বিপর্যস্ত আর্যরা তাদের ঘৃণা করেছে -অনার্য বলে ধিক্কার দিয়েছে। বাংলার আর্যরাজের বিরুদ্ধে হয়েছে কৈবর্ত বিদ্রোহ; মুঘল আমলে দিল্লীর বাদশাহী মসনদকে অস্বীকার করেছে বাংলার চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশাখাঁ, প্রতাপাদিত্য, ভুলুগাজী, লক্ষ্মণ মাণিক্য। পলাশী প্রান্তরে প্রথম প্রতিরোধ শেষে ১৭৭৬ সালে ব্রিটীশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঁকুড়ায় প্রথম কৃষক বিদ্রোহ; ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুরে পণ্ডিতশাহের নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ; বিদ্রোহী বাংলার বিদ্রোহের ইতিহাসে বাংগালীর রক্ত-স্বাক্ষর। তিতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মেদিনীপুরে চোয়ার বিদ্রোহ—গণবিদ্রোহের ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল নজীর।

তারপর ১৮৫৭ সাল। ব্যারাকপুরের ছাউনীতে মংগল পাঁড়ের

এবং ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) বাংগালী সিপাহীর রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়েছে। ১৮৬০ সালে নীলকর বিদ্রোহ নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলকব চাষীদের সমুচ্চারিত প্রতিবাদ।

কোনকালেই বাংলাদেশ বিদেশী শাসন ও শোষণকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। এর জন্যে তাকে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে; মূল্যও দিতে হয়েছে প্রচুব। কিন্তু তবু বিদ্রোহী বাংলার বিদ্রোহ বিদ্রোহই রয়ে গেছে, বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়নি। ধ্বংসের ওপর মহাসৃষ্টির মংগল শঙ্খ ধ্বনিত হয়নি। কারণ কোন বিদ্রোহই সংগঠিত রূপ নিতে পাবেনি; একটা নির্দিষ্ট আদর্শবোধে বাংলা দেশের সমগ্র জনতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি; সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রীভূত করতে পাবেনি। ফলে প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পিছু হটেছে বিদ্রোহী বাংলা। পিছু হটেছে সত্যি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে আত্মবিসর্জন করেনি; আত্মলয় ঘটেনি তার। ধাক্কা খেয়ে শম্বুকের মতো গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে এবং তার শক্ত আবরণের নীচে অতি সর্তকতার সাথে রক্ষা করেছে তার সংস্কৃতি, জীবন-চর্যায় তার স্বাতন্ত্র্য।

বিদ্রোহী বাংলা নাটকের দ্বিতীয় অংকের শুরু ১৯০৫ সালে। ইংরেজের Divide and Rule নীতির সার্থক রূপদানের প্রয়াস পেলো লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরে, বাংলাকে বিভক্ত করে। গর্জে উঠলো বিদ্রোহী বাংলা। ১৬ই অক্টোবর হলো জাতীয় শোক-দিবস। বিক্ষুব্ধ বাংলার মাঠে মাঠে অবরুদ্ধ ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটলো—"We shall unsettle the settled fact." বাংলার ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, বাংলার মানুষ এক। বাংলার মানুষকে দ্বিধা-বিভক্ত করবার ক্ষমতা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের নেই। পিছু হটলো চক্রান্ত-কারী ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ। তাদের "settled fact" বাংলার মানুষের রুদ্র আক্রোশে unsettled হয়ে গেলো।

বংগ-ভংগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বিদ্রোহী বাংলার অগ্নি-যুগের সূচনা। সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ বেছে নিলো বাংলার তরুণ সমাজ। সাম্রাজ্যবাদের শতাব্দীর পাষাণ-চাপকে হটিয়ে দিতে হবে সজোরে। রক্তস্নানের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে স্বাধীনতার অমৃত আস্বাদ। ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল। মজঃফরপুরে ঘটলো প্রথম সাগ্নিক বিস্ফোরণ। জেলাজজ কিংসফোর্ডের ফিটনগাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে মারলো ক্ষুদিরাম আর বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী। ১লা মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। ২রা মে পুলিশের হাত এড়াতে না পেরে প্রফুল্ল চাকী মোকামাঘাটে আত্মহত্যা করলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হলো। ফাঁসীর আদেশ কার্যকরী করা হলো ১৯০৮ সালের ১৭ই আগস্টে। হাসতে হাসতে ফাঁসী-কাষ্ঠে প্রাণ দিলেন ক্ষুদিরাম। তারপর শুরু হলো বাংলার ঘরে ঘরে প্রাণ দেয়া আর প্রাণ নেয়ার খেলা। জেলখানাতে মাণিকতলা বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে প্রাণ উৎসর্গ করলেন বাংলার দামাল ছেলে কানাই আর সত্যেন।

এরপর বুড়ী বালামের তীর। তার আগে মাণিকতলা বোমা মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস এবং মামলার প্রধান উদ্যোক্তা গোয়েন্দা শিরোমণি সামছুল আলমকে হত্যা করে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মাহুতি দিলেন যথাক্রমে চারু বসু এবং বীরেন দত্তগুপ্ত।

বুড়ী বালামের তীর। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ খালাস করতে গেলেন বাংলার বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতিষ পাল। টের পেয়েছিলো শিকারী কুকুর ডেনহাম, টেগার্টের দল। দুই পক্ষে হলো প্রচণ্ড সংঘর্ষ। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী প্রাণ দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। গুলীতে গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো সুঠাম শরীর। আহত বাঘা যতীন প্রাণ

দিলেন হাসপাতালে। আর নীরেন দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ফাঁসীর রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। বিচারে জ্যোতিষ পালের হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন। ঢাকার কলতাবাজারে পুলিশের সাথে প্রকাশ্য লড়াইয়ে প্রাণ দিলেন তারিণী মজুমদার আর নলিনী বাগ্চী। মৃত্যু-পাগল বাংলার তরুণদল প্রাণ দেয়ার আনন্দে মেতে উঠলো। প্রাণ দিলো গোপীনাথ সাহা, প্রমোদ চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র; প্রাণ দিলো শত শত যুবক। স্বাধীনতার বেদী-মূলে বাংলার তারুণ্যের রক্ততর্পণ।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। বাংলা দেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। সেদিন বাংলা দেশের পূর্বদিগন্তে বিদ্রোহের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো সূর্য সেন-এর (মাস্টার-দার) নেতৃত্বে। সে কী জ্বালা! সে কী বহ্ন্যুৎসব! সে কী সুপ্ত আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! সে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেদিন আসমুদ্রহিমাচল কেঁপে উঠেছিলো। কেঁপে উঠেছিলো সাতসমুদ্র তের নদীর পারে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের মন্ত্রণালয়। বীর বিপ্লবীরা সেদিন বুকের রক্ত ঢেলে দেশমাতৃকার যে পূজা করেছিলেন, তা শতাব্দীর ইতিহাসের মণিকোঠায় এক অপূর্ব সঞ্চয়ন। সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লালমোহন সেন, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হিমাংশু সেন, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল, অর্ধেন্দু দস্তিদার, কালী চক্রবর্তী, রণধীর দাশগুপ্ত, হরিবল, রজত সেন, স্বদেশ রায়, শম্ভু দস্তিদার, হেমেন্দু দস্তিদার, প্রভাস বল, মনোরঞ্জন, দেবপ্রসাদ, অপূর্ব সেনের দল সেদিন জালালাবাদ পাহাড়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন, তার নজীর পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলা বীর প্রসবিনী। বীর প্রসবিনী বাংলা জন্ম দিয়েছিলো বাদল, দীনেশ, বিনয়, বিমল, রাজেন লাহিড়ী—এমনি শত সহস্র

সন্তানকে, যাঁরা স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে গিয়েছেন হাসিমুখে। শুধুই কী ছেলেরা? বাংলার মেয়েরা? প্রীতিলতা, কল্পনা, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, অরুণা—এমনি শত শত বীরাংগনা সেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামী পতাকাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে জীবনের বিনিময়ে সমুচ্চে তুলে ধরেছিলো। প্রাণ দিয়েছে, দুঃসহ কাবাবাসে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে কিন্তু পতাকাকে ভুলুণ্ঠিত হতে দেয়নি।

বাংলা দেশ জন্ম দিয়েছে আজন্ম বিপ্লবী রাসবিহারী বসু আর স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক সুভাষকে। বিদ্রোহের একনিষ্ঠ নায়ক রাসবিহাবী জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। মহানায়ক সুভাষ বসুর মধ্যে বাংলা দেশ পেয়েছিলো ভারতেব রাজনীতিতে বিপ্লবী বাংগালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গিয়েছিলেন, ভারতের মুক্তির জন্যে। ভিন্‌দেশে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন ভারতেব স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মুক্তিফৌজ I. N. A। পূর্ব দিগন্তে সূর্যের প্রথম আবির্ভাব। পূর্বাঞ্চল থেকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হেনেছিলেন নেতাজী সুভাষ। নেতাজী সুভাষ বসুর মধ্যে ঘটেছিলো বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামরিক শক্তির সমন্বয় ও বিকাশ। তাই নেতাজীর অন্তর্ধানের পরও সে নেতৃত্ব ছিলো অটুট। নৌবিদ্রোহে, নেতাজী দিবসে, শাহনওয়াজ দিবসে, রশীদ আলী দিবসে ভারতের ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো বিদ্রোহের দাবাগ্নি। পুড়ে ছাই করে দিয়েছে ভারতের বুকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের দম্ভের শেষ চিহ্ন।

বাংলাদেশ লড়েছে। লড়েছে মুক্তির জন্যে; বাংলার মুক্তির জন্যে, সারা ভারতের মুক্তির জন্যে। বার বার সে আঘাত খেয়েছে, কিন্তু আঘাত খেয়ে আহত পাখীর মতো আর্তনাদ করেনি, ব্যর্থতার

ক্রন্দনে ভেংগে পড়েনি। সমস্ত আঘাত সে বুক পেতে নিয়েছে, সর্বাংগে রুধিব মেখে অন্যায়, অবিচার, পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; রক্ত আখরে মুক্তি সংগ্রামে স্বাক্ষব করেছে।

তাবপর স্বাধীনতা এলো একদিন। কিন্তু বাংলার মানুষের বন্ধন মোচন হলো না। সে পেলো না মুক্তির আস্বাদ। ভাগ্যে তাব জুটলো বঞ্চনা, - নিষ্ঠুর বঞ্চনা। পদ্মাব পারে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বাংলার মানুষ দেখলো, জাতি হিসেবে বাংগালী হয়েছে বিদেশী এবং দেশী শোষকশ্রেণীব চক্রান্তের শিকার। সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা তার কাছে হয়ে দাঁড়ালো নির্মমতম পরিহাস। সুতরাং আবার সংগ্রামের পালা। এবাবের সংগ্রাম আরো নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট অংগীকাবের প্রখব আলোকে দেদীপ্যমান;—মুক্তির সংগ্রাম।

আজ বাংলা দেশ লড়ছে। লড়ছে মুক্তির জন্যে। মহানায়কের একটি নির্দেশে চলছে মুক্তির লড়াই। চল্‌ছে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহী বিপ্লবী বাংলার রক্তদানের শেষ পর্ব। বিদ্রোহের বিপ্লবে রূপান্তর হয়েছে। পরাধীনতার শৃংখল গেছে টুকবো টুকরো হয়ে। রুদ্ধ লৌহ কপাটের অর্গল হয়েছে মুক্ত। আব দেরি নেই; প্রভাতী আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠবে বাংলার শিশির-ভেজা মাটি। জাতীয়তার মহাসংগীতে উদ্দীপ্ত জাতি এবার মহা-শশ্মানের বুকে গড়ে তুলতে চলেছে এক উন্মুক্ত, উদাত্ত মহাজীবনের কাকলিতে ভরা মহানগর। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চেই সেই মহানগরের গোড়াপত্তন হলো।

২৫শে মার্চ : একটি নির্দেশ

১৯৭১ সাল। ২৫শে মার্চ। ন্যায়, নীতি, মানবতার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত দিন। গভীর রাতে পাকিস্তানের জংগী রক্তলোলুপ শাসকচক্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে হিংস্র হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো বাংলা দেশের নিরস্ত্র নিদ্রিত মানুষের ওপর। কামানের গোলায়, বোমাব আঘাতে গুড়িয়ে দিলো অসংখ্য ঘরবাড়ী। নিদ্রিত মানুষ ঘুম থেকে জেগে ওঠার অবসর পেলো না। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলো বস্তির অসংখ্য ঘর। জীবন্ত দগ্ধ করলো শিশু, বৃদ্ধ আর অগণিত মানব সন্তান। ব্যারাক থেকে ছেড়ে দেয়া হিংস্র পশুদের লোভার্ত গর্জন। অবাধ গণহত্যা আর ধর্ষণ। চারদিকে মৃতদেহের স্তূপ। যানবাহন চলাচল বন্ধ। ধর্ষিতা নারীর আর্ত চীৎকারে ছিঁড়ে বিদীর্ণ হয়েছে গভীর নিশ্চল রাত্রির নিস্তব্ধতা। ছোপ্ ছোপ্ রক্তে লাল বাংলার শ্যামল মাটি, কালো পীচ-ঢালা রাজপথ। বুড়ি-গংগায় অত জল নেই, যত রক্ত ঝরেছিলো সে একটি রাতে বাংলাব মাটিতে।

১৯৭১ সাল। ২৫শে মার্চ। পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এশিয়া ভূখণ্ডে সেদিন জন্ম নিলো এক নোতুন স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বাধীন বাংলা দেশ। বাংলা দেশের অবিসম্বাদিত মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ পাঠালেন। ইথার তরংগে তাঁর ঘোষণা ও নির্দেশ ভেসে এলো: "বিদেশী শত্রুসৈন্য বাংলা দেশ আক্রমণ করেছে গভীর রাতের অন্ধকারে। ঢাকা, খুলনা, কুষ্টিয়ায় তারা লক্ষাধিক ঘুমন্ত লোককে হত্যা করেছে। এই বর্বর আক্রমণ এবং নির্মম গণহত্যার কথা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে জানিয়ে দাও। বাংলার সন্তান যে যেখানে আছো, হাতের অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াও, বিদেশী শত্রুর পশুশক্তির বিরুদ্ধে; হানাদারদের প্রতিহত করো।"

একটি ঘোষণা, একটি নির্দেশ। বিদ্যুৎ চমকে জেগে উঠলো বাংলার মানুষ। ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেবে এলো বাংলার বীর জনতা। সশস্ত্র হিংস্র পাশবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার তীব্র প্রতিরোধ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগরে নগরে, বন্দরে বন্দরে, শুধু একটি মাত্র ধ্বনি—"জয় স্বাধীন বাংলা।" শুধু একটি মাত্র গান —"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

হিংস্র দানবীয় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পাশবশক্তির দম্ভে রক্তের গংগায় ডুবিয়ে দিতে চাইলো মুক্তিপাগল কোটি কণ্ঠের স্বাধীনতার সংগীত। নারকীয় অত্যাচারে বিধ্বস্ত করতে চাইলো দেশপ্রেমের উত্তুংগ দুর্গতোরণ। কিন্তু ব্যর্থ হলো তারা। ঘোষিত হলো স্বাধীন বাংলা সরকাব। স্বাধীন বাংলার বার্তা নিয়ে দেশে দেশে ছুটলো স্বাধীন বাংলার প্রতিনিধিঃ স্বীকৃতি দাও; শোষণের শৃংখল ভেংগে, অন্ধকারের জঠর থেকে যে শিশু জন্ম নিলো, তাকে স্বীকৃতি দাও। পশু শক্তিব বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে হাতিয়ার দাও।

মুক্ত বিশ্ব বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পশুশক্তির এই নারকীয় ধ্বংসলীলার দিকে। বিবেক যেন তাদের স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। শান্তির নামাবলী গায়ে দিয়ে বৃহৎ শক্তি হাত গুটিয়ে বসে আছে। পশ্চিম পাকিস্তানী জংগী শাসক প্রচার করলো- কিছু সংখ্যক দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারী ভারতের চক্রান্তে পাকিস্তানকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, তাদের সীমান্তের ওপারে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাক-সেনার সীমাহীন বর্বরতার প্রকৃত তথ্য জানা সত্ত্বেও বিশ্ব-বিবেক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো না। পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী ধর্মের আলখাল্লা পরে প্রচার করলো—মুসলমানের দেশ পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে ইসলামকে বিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলো ষড়যন্ত্রকারীরা; প্রমাণ, মুসলমান অবাংগালীদের তারা হত্যা করেছে। আর সামরিক শক্তি দাংগা দমন করতে সামান্যতম

ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মাত্র, ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান এবং মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্যে। মুসলিম জাহান, এমনকি আরব প্রজাতন্ত্র সে জঘন্য মিথ্যা প্রচারকে বিশ্বাস করেছে, এগিয়ে এসেছে মানবতার দুশ্‌মন পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শক্তিকে সাহায্য করতে ইসলামকে রক্ষা কবার জন্যে। কিন্তু তারা পশ্চিম পাকিস্তানী জংগী সরকাবকে প্রশ্ন করলো না, ইসলামের কোন্ বিধান বলে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করছে বাংলা দেশের নিরস্ত্র নিরীহ নরনারী বৃদ্ধ শিশুদের? দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করছে মুসলমান নারী আর গৃহস্থ বধূ-কন্যাদের?

স্বার্থ আর ধর্মোন্মত্ততাব যূপকাষ্ঠে আজ ন্যায়, নীতি মানবতাকে বলি দিতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রেব শাসকচক্রের বাধছে না। কিন্তু এই স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর বাইরে আছে বিশ্বের কোটি কোটি জনতা, যারা আজ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত বর্বর হত্যাকাণ্ড আর নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর। তাবা জেনেছে এবং বধির বিশ্বকে জানাতে চাইছে, কেন এই জাতীয় উত্থান? কেন এই মুক্তিযুদ্ধ? কেন?

বঞ্চনার ইতিহাস

কেন এই মুক্তিযুদ্ধ,—এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জানতে হবে পাকিস্তানেব সাড়ে তেইশ বছরের ইতিহাস, যে ইতিহাস বাংলা দেশকে বঞ্চনার ইতিহাস; যে ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানী বাইশটি পরিবার কর্তৃক বাংলাদেশকে লুণ্ঠনের ইতিহাস। এই তেইশ বছরে সোনার বাংলা শ্মশান হয়েছে, আর পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে গড়ে উঠেছে বিলাসের স্বাক্ষব—নগরের পর উপনগরী আর গ্রাম জনপদ। ষড়যন্ত্র। বঞ্চনার ষড়যন্ত্রের শিকাব হয়েছে সোনাব বাংলা, আর সোনার বাংলার সরল নিরীহ মানুষ। বাংলাদেশকে বঞ্চনার এই ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের সৃষ্টি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পবে নয়—জন্মেব পূর্ব থেকে। সুপরিকল্পিত এই ষড়যন্ত্র। ইতিহাস তাব সাক্ষ্য।

১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবর। জিন্নাহ্ অন্তবর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। প্রতিনিধিদের নাম ঘোষিত হলো—লিয়াকত আলী খান, ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড়, সর্দার আব্দুর রব নিশতাব, গজনফর আলী খান, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। অন্তবর্তী সরকারে প্রতিনিধিত্ব কবার জন্যে সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, এমনকি নাজিমুদ্দীনেরও ডাক পড়লো না। ষড়যন্ত্রকারীদের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি হিসেবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের ঠাঁই হলো অন্তর্বর্তী সরকারে। অথচ পাকিস্তানের দাবীতে মাত্র কয়েকমাস পূর্বে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলা দেশের মুসলমানেরা শতকরা ছিয়ানব্বুইটি ভোট দিয়েছিলো, আর পাঞ্জাব দিয়েছিলো মাত্র শতকরা ঊনপঞ্চাশটি ভোট। ক্ষমতার্জনের সোপান তৈরীতে ব্যবহৃত হলো বাংলার শক্তি; অথচ ক্ষমতা গ্রহণকালে বর্জিত হলো বাংলার প্রতিনিধি। ক্ষমতাগ্রহণের রাজনীতিতে বাংলার মানুষের বঞ্চনার আরম্ভ তখন থেকে।

তাবপব ক্রমাগত কী বাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টনে, কী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংগালীরা হয়েছে বঞ্চিত, হয়েছে শোষিত। পাঞ্জাবী কায়েমী স্বার্থেব যুপকাষ্ঠে প্রতিদিন বলি দেয়া হয়েছে বাংলাব মানুষের ন্যায়সংগত দাবী।

উনিশ শ' সাতচল্লিশেব চৌদ্দই অগাস্টে জন্ম হলো পাকিস্তান বাষ্ট্রেব—জিন্নাহ্ ব পাকিস্তান, মুসলমান নবাব, নাইট, জমিদাব, শিল্পপতি, বিত্তশালী শ্রেণীব পাকিস্তান। পি ফব পাঞ্জাব, এ ফব আফগান, কে ফব কাশ্মীব, এস্ ফব সিন্ধু, তান ফব বেলুচিস্তান, সব মিলিযে পাকিস্তান—কেম্ব্রিজেব পাঞ্জাবী ছাত্র চৌধুবী বহমত আলীব স্বপ্ন পাকিস্তান —পবিত্র দেশ। এই পবিত্রদেশেব পবিকল্পনায় বাংলা দেশ ছিলো না। সেজন্যে নামেব মধ্যেও বাংলাব অস্তিত্ব টিকে বইলো না।

যেমনি পাকিস্তান নামেব মধ্যে বাংলাব অক্ষব হলো উপেক্ষিত, তেমনি বাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সম্পদ বণ্টনেব ক্ষেত্রেও বাংলা হলো বঞ্চিত। বাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কবলো পশ্চিম পাকিস্তানেব নবাব, নাইট, জমিদাব, জাযগীবদাব প্রভৃতি বিত্তবান শ্রেণীব লোক। এব সাথে হাত মেলালো পাঞ্জাব এবং ভাবত থেকে আগত পশ্চিম পাকিস্তানে ডোমিসাইল্ড মুসলিম ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সেগল, বেংগুনওয়ালা দাউদ, আদম, ইস্পাহানীব দল। পাকিস্তানেব অর্থনীতিব ওপব নিজেদেব কব্জা সুদৃঢ কবাব সংগে সংগে সবকাবী ক্ষমতা এবং প্রশাসন যন্ত্রও এবা নিজেদেব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো। এই ছোট্ট সুসংবদ্ধ বাইশটি পরিবাবেব গোষ্ঠীই হয়ে উঠলো পাকিস্তানেব প্রকৃত নিয়ামক—ভাগ্যবিধাতা। সাবা পাকিস্তানেব শতকরা আশীভাগ সম্পদের মালিক হলো এই বাইশটি পবিবার। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবে শিল্প-কাবখানা আর সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠলো, আর বাংলাদেশ হলো তার কাঁচা মালের জোগানদার-উপনিবেশ। সেখানে চললো নিয়ত, নিরন্ন ভূখা মানুষের মিছিল।

বঞ্চনা শুধু বঞ্চনা; শোষণ—তীব্রতর শোষণই শুধু জুটলো বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে। এই শোষণ আর বঞ্চনার হিসেব পাওয়া যাবে নীচের কয়েকটি উদাহরণ থেকে,—

উনিশ শ' আটচল্লিশ সাল থেকে উনিশ শ' তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ত্রিশ কোটি টাকা করে—মোট এক শ' আশী কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা নিয়ে গেছে বাংলা দেশ থেকে। উনিশ শ' আট চল্লিশ এবং উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সাল এ—দু'বছরে প্রাদেশিক সরকারেব উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ঋণের চব্বিশ কোটি টাকার মধ্যে একা পাঞ্জাব পেলো দশ কোটি টাকা, আর বাংলাদেশ পেলো মাত্র আট কোটি টাকা। উনিশ শ' উনপঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ সালে পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কার্যসূচীব জন্যে পঁয়ত্রিশ কোটি ষোল লক্ষ টাকা এবং উনিশ শ' পঞ্চাশ-একান্ন সালে ছেচল্লিশ কোটি আটান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই টাকার নব্বুই ভাগ খরচ হলো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে। উনিশ শ একান্ন সালে পাকিস্তানে যে বায়ান্ন হাজার টন লোহা আমদানী করা হয়, তার সবটাই যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলা দেশের শিক্ষাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্তর লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয় উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে। কিন্তু ঐ বছরই পাঞ্জাব বিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয় চার কোটি দশ লক্ষ টাকা। উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে করাচী, লাহোর এবং পেশোয়ার—এই তিনটি বেতার কেন্দ্রের জন্যে ব্যয় করা হয়েছিলো নয় লক্ষ বারো হাজার টাকা; কিন্তু ঢাকা বেতার কেন্দ্রের জন্যে ব্যয় করা হলো মাত্র এক লক্ষ বিরানব্বুই হাজার টাকা। ঐ বছর দেশরক্ষা খাতে মোট ব্যয় আশী কোটি টাকা, তার মধ্যে আটাত্তর কোটি টাকা খরচ হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে। উনিশ শ' আটচল্লিশ থেকে উনিশ শ' তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ যে বিদেশী মুদ্রা আয় করেছিলো, তার সবটাই খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চপদে চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য : উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের একটি হিসেব

বিভাগ (Department)	বাংগালী	পশ্চিম পাকিস্তানী
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েট	৪২	৬৯২
শিল্প-উন্নয়ন করপোরেশন	৩	১৩২
বেতার কেন্দ্র	১৪	৯৮
সরবরাহ ও উন্নয়ন	১৫	১৬৪
রেলওয়ে	১৪	১৫৮
ডাক ও তার বিভাগ	৫০	২৭৯
কৃষি অর্থনীতি করপোরেশন	১০	৩৮
সার্ভে	১	৬৪
বিমান-বাহিনী	৭৫	১০২৫

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটে সেক্রেটারী পদে একজনও বাঙালী ছিলো না। প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীয়েটে বাংগালী শতকরা ১৯ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শতকরা ৮১ জন।

পদ	বাংগালী	পশ্চিম পাকিস্তানী
জয়েন্ট সেক্রেটারী	৮	২২
ডেপুটি সেক্রেটারী	২৩	৫৯
প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার	৮১১	৩৭৬৯
দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার	৮৮৪	৪৮০৫
দ্বিতীয় শ্রেণীর নন্‌গেজেটেড অফিসার	১১৮০	
তৃতীয় শ্রেণীর নন্‌গেজেটেড অফিসার	১৩৭২৪	১,৩৭,[illegible]

বিদেশী রাষ্ট্র দূতাবাসে বৈষম্য ঃ
উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের হিসেবে

	বাংগালী	পশ্চিম পাকিস্তানী
রাষ্ট্রদূতসহ প্রথম শ্রেণীব কর্মচাবী	৫৮	১৭৯
দ্বিতীয় শ্রেণীব কর্মচাবী	৪৮	১৯৬
তৃতীয় শ্রেণীব কর্মচাবী	১৭	৫৮
চতুর্থ শ্রেণীব কর্মচাবী	৮	৮৯

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা বিভাগে বৈষম্য ঃ
উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের হিসেবে

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
নোতুন কলেজ	০	১
মেডিক্যাল কলেজ	১	৬
ইঞ্জিনীয়াবিং কলেজ	১	৩
বিশ্ববিদ্যালয়	২	৪
কলেজ	৫৬	৭৬
প্রাইমাবী স্কুল	২২১৭	৬২৪৬
হাসপাতালে বেডেব সংখ্যা	৫৫৮৯	১৭,৬১৪
ডাক্তার	৩৩৯৩	৮৫০০
মেটাবনিটি হাসপাতাল	২২	১১৮

"প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বাংলা দেশকে দেয়া হয়েছে মোট ৭৯,৫৫৫ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছে ১১৪,৩৫০ কোটি টাকা। উনিশ শ' [illegible] সাল পর্যন্ত বাংলা দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায় ৪৭৪ [illegible]কা লাভ করেছে, আর পশ্চিম পাকিস্তান এই সময়ের [illegible]দেশিক বাণিজ্যে লোকসান দিয়েছে ৭০৩ কোটি টাকা।"
[illegible]কিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য]

উনিশ শ' আটান্ন সালের চৌঠা জুন তারিখে বাংলাদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন যে, উনিশ শ' সাতচল্লিশ সাল থেকে উনিশ শ' সাতান্ন সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা দেশ থেকে ২২২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেন। আর বাংলা দেশের জন্যে রাজস্ব থেকে ব্যয় করেন মাত্র তেষট্টি কোটি টাকা। ঐ কয় বছরে পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আট শ' এগারো কোটি টাকা আদায় করলেও খরচ করেছে এক হাজার পাঁচ কোটি টাকা (পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে)। এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক খাতে ব্যয় হয় চার শ' আশী কোটি টাকা ; আর বাংলা দেশে ব্যয় করা হয় মাত্র আঠারো কোটি টাকা। উনিশ শ' বাষট্টি-তেষট্টি সালে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে এক শ' কোটি টাকা, অথচ বাংলা দেশে ঐ খাতে ব্যয় হয়েছে মাত্র এক কোটি টাকা।

বিদেশী বিশেষজ্ঞ John H. Power-এর Pakistan Development Review পত্রিকায় প্রদত্ত একটি হিসেব থেকে পাওয়া যায় উনিশ শ' আটচল্লিশ থেকে উনিশ শ' একষট্টি সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান বাংলা দেশের রপ্তানীর উদ্‌বৃত্ত এক শ' পঞ্চাশ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এ ছাড়া বাংলা দেশের সংগে বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তান আরও তিন শ' পঞ্চাশ কোটি টাকা লাভ করেছে। Power সাহেবের মতে, বিদেশী সাহায্য বাবদ এই কয় বছরে বাংলা দেশের প্রাপ্য পাঁচ শ' কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তান আত্মসাৎ করেছে। এ দুটো হিসেব থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শ' আটচল্লিশ সাল থেকে উনিশ শ' একষট্টি সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের মোট আট শ' পঞ্চাশ কোটি টাকা গ্রাস করেছে।

প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলা দেশকে ঋণ দেওয়া

হয়েছে মাত্র আটানব্বুই কোটি টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে চার শ' ছিয়ানব্বুই কোটি টাকা। উনিশ শ' সাতান্ন সালের এক হিসেব থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানের মূল ধাতু-শিল্পের বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র-শিল্পের আটানব্বুই ভাগ উৎপাদন হয় পশ্চিম পাকিস্তানে; আর মাত্র দুভাগে উৎপাদন হয় বাংলা দেশে। জুতো উৎপাদন হয় বাংলা দেশে মাত্র শতকরা চার ভাগ, আর পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ছিয়ানব্বুই ভাগ। বস্ত্রশিল্পে শতকরা পঁচিশ ভাগের কম উৎপাদন হয় বাংলা দেশে।

পাকিস্তানের সমস্ত ভারী ও মূল শিল্প প্রধানতঃ আমদানীর ওপর নির্ভরশীল। এই আমদানীর টাকাটা আসে পূর্ব-বাংলার চা ও পাট রপ্তানী থেকে। কিন্তু আমদানী হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। আমদানীর সিংহভাগ লুটে নিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান, বাংলাদেশ হয়েছে বঞ্চিত। বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছে শিল্পের প্রসার। শিল্পে বিকাশপ্রাপ্ত পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশকে করেছে তীব্র শোষণ। বাংলাদেশ থেকে গেছে কাঁচা চামড়া, কাঁচা তামাক, সর্ষের বীজ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছে তৈরী জুতো, সিগারেট, সর্ষের তেল, সাবান। বাঙ্গালীকে তা কিনে নিতে হয়েছে চড়া দামে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্যে।

পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে নগ্নভাবে শোষণের আর একটা হিসেব পাওয়া যাবে উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের একটা হিসেব থেকে। ঐ বছরে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করতে হয়েছে :

জুতো—পঞ্চাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকার।

সাবান—তেত্রিশ লক্ষ চার হাজার টাকার।

সিগারেট—এক কোটি একান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকার।

সূতী কাপড়—দু'কোটি সত্তর লক্ষ নব্বুই হাজার টাকার।

চিনি—নয় লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার।

সর্ষে ও রেড়ির তেল—ছিয়াত্তর লক্ষ এগারো হাজার টাকার।

এবং লবণ—চুয়ান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকার।

উনিশ শ' পঞ্চান্ন সাল থেকে উনিশ শ' ষাট সালের মধ্যে বাংলাদেশে কারখানার উৎপন্ন পণ্যের শতকরা প্রায় আটচল্লিশ ভাগ আসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। অথচ এ সময়ে বাংলা দেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তান আমদানী করেছে মাত্র শতকরা সাড়ে সতরো ভাগ।

আমদানী রপ্তানীর আরও দুটি হিসেব ঃ

রপ্তানী বাণিজ্য

সাল	বাংলা দেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৮-'৪৯	৪২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	৫২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা
১৯৪৯-'৫০	৬১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
১৯৫০-'৫১	১২১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা	১৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
১৯৫১-'৫২	১০৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা	৯২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
১৯৫২-'৫৩	৬৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	৮৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা
১৯৫৩-'৫৪	৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	৬৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
১৯৫৪-'৫৫	৭৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	৪৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
১৯৫৫-'৫৬	১০৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা	৭৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
১৯৫৬-'৫৭	৯০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা
১৯৫৭-'৫৮	৯৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	৪৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৫৮-'৫৯	৮৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা	৪৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৫৯-'৬০	১০৮ কোটি টাকা	৭৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
১৯৬০-'৬১	১২৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	৫৪ কোটি টাকা
১৯৬১-'৬২	১৩০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা	৫৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
১৯৬২-'৬৩	১২৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	৯৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা
১৯৬৩-'৬৪	১২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা	১০৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
১৯৬৪-'৬৫	১২৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	১১৪ কোটি টাকা
১৯৬৫।৬৬-৭০	৭৭৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	৭৮৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
মোট	২৪৩৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা	২০৫৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা

আমদানী বাণিজ্য

	বাংলা দেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৮-'৪৯	২৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	১১৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
১৯৪৯-'৫০	৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	৯১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
১৯৫০-'৫১	৪৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	১১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
১৯৫১-'৫২	৭৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	১৪৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৫২-'৫৩	৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	১০১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা
১৯৫৩-'৫৪	২৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা	৮২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৫৪-'৫৫	৩২ কোটি টাকা	৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
১৯৫৫-'৫৬	৩৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা	৯৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৫৬-'৫৭	৮১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	১৫১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
১৯৫৭-'৫৮	৭৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	১৩১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৫৮-'৫৯	৫৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা	১০২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৫৯-'৬০	৬৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	১৮০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
১৯৬০-'৬১	১০১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা	২১৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
১৯৬১-'৬২	৮৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	২২৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
১৯৬২-'৬৩	১০১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	২৮০ কোটি টাকা
১৯৬৩-'৬৪	১৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা	২৯৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
১৯৬৪-'৬৫	১৭০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা	৩৬৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
১৯৬৫।৬৬-৬৯।৭০	৭৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	১৬১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
	১৯৯৬ কোটি টাকা	৪৩৯৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা

ওপরের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে ১৯৬৯-'৭০ সাল পর্যন্ত রপ্তানী বাণিজ্যে বাংলা দেশ আয় করেছে ২৪৩৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ঐ সময়ে আমদানী করেছে ১৯৯৬ কোটি টাকার পণ্য দ্রব্য। অর্থাৎ বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশের

উদ্বৃত্ত হয়েছে ৪৪০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। অপর পক্ষে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান আয় করেছে মাত্র ২০৫৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, অথচ আমদানী করেছে ৪৩৯৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার পণ্য। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি হয়েছে ২৩৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।এ ঘাটতি পূরণ হয়েছে বাংলা দেশের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে এবং এ ঘাটতি পাঞ্জাবী শাসক ও শোষক চক্র পূরণ করতে চায় বাংলাদেশেব উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে।

বাংলাদেশ কৃষি-নির্ভর দেশ। কৃষকদেব ঋণ দেয়া হয় সমবায় সমিতিব ঋণদান সমিতিগুলোর মাধ্যমে এবং সরকার-সৃষ্ট কৃষিব্যাংকের মাধ্যমে। উনিশ শ' সাতচল্লিশ আটচল্লিশ সালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছিলো। উনিশ শ' সাতান্ন সালে সে ঋণ কমিয়ে মাত্র দেড় লক্ষ টাকায় নাবিয়ে দেয়া হলো। উনিশ শ' ষাট সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিতে ঋণ দেয়া হয়েছে একুশ কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা, কিন্তু বাংলাদেশ পেয়েছে মাত্র এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। বাংলাদেশে বন্যা প্রতিবোধেব জন্যে বাঁধেব টাকা এলো না; অথচ সিন্ধু উপত্যকা পরিকল্পনায় ব্যয় করা হলো পনরো শ' কোটি টাকা। বাংলাদেশের রূপপুরের আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো টাকার অভাবে; কিন্তু, করাচীর আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদক পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চললো দ্রুতবেগে; তাতে টাকার 'কমৃতি' হলো না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বঞ্চনা আরও নির্লজ্জ এবং নগ্ন। উনিশ শ' চুয়ান্ন সাল থেকে উনিশ শ' তেষট্টি সাল পর্যন্ত দশ বছরে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে বাংলাদেশ পেয়েছে এক কোটি একানব্বুই লক্ষ টাকা, কিন্তু ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে সাত কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকা। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বাংলা দেশের জন্যে বরাদ্দ হলো সত্তর লক্ষ টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে বরাদ্দ করা হলো

এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডঃ কুদরত-ই-খুদা এর প্রতিবাদ করলেন বাংলাদেশকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যে বঞ্চনা করা হয়েছে, তিনি তার অবসান দাবী করলেন। ফল মিল্‌লো হাতে হাতে। পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ডিরেক্টরের পদ থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন।

ওপরে প্রদত্ত হিসেব থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাংলা দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক-চক্র কিরূপ নির্লজ্জ ও নগ্নভাবে শোষণ করেছে, লুণ্ঠন করেছে, বঞ্চনা করেছে। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র (!)। ইসলামের বাণী "সারা দুনিয়ার মুসলমান ভাই-ভাই"। প্রয়োজনবোধে শাসক ও শোষকচক্র ধর্মের জিগীর তুলেছে, নিরীহ মানুষের রক্তে বাংলার পবিত্রভূমি কলংকিত করেছে, —একমাত্র উদ্দেশ্য শোষণ এবং লুণ্ঠন। এ লুণ্ঠন ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, ধর্মের ভিত্তিতে এক-জাতির নামে। নির্মম শোষণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান সম্পদশালী হয়েছে প্রতিদিন। নির্দয় লুণ্ঠনের ফলে বাংলাদেশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মীয় জিগীর শোষণ ও লুণ্ঠনের সহায় হয়েছে; হয়েছে হাতিয়ার। বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে, শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে, রাজ-নীতিবিদের কাছে এ লুণ্ঠনের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে যেদিন ধরা পড়লো, সেদিনই বাংলার মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো, সেদিনই বাংলার মানুষ নেবে এলো মাঠে। লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিলে সেদিন বাংলার মাটি কেঁপে উঠলো; কোটি কণ্ঠের বজ্র আওয়াজে সেদিন বাংলার স্বাধিকারের দাবী শোষণের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিলো। এ শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্যে আজ পাঞ্জাবী শোষকচক্রের হায়নারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলার বুকে, তার হিংস্র নখরে বাংলার শ্যামল দেহকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। আর শোষণ থেকে চির-মুক্তির জন্যেই বাংলার মানুষ তার অস্ত্রকে উদ্যত করেছে উদ্ধত শোষক

শ্রেণীর বিরুদ্ধে। তাই আজ হিংস্র দানবের সাথে চলেছে মুক্তিকামী মানুষের মরণ-পণ যুদ্ধ।

কিন্তু বাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধের শুরু এখন নয়। বাংগালী মুক্তিযুদ্ধে নেবেছে পাকিস্তান স্থষ্টির পর থেকে। শোষক-চক্রের এ আক্রমণ কোন বিচ্ছিন্ন আকস্মিক আক্রমণ নয়, তাদের এ আক্রমণ অনেকগুলো ব্যর্থ আক্রমণের পর এক চূড়ান্ত আক্রমণ। পাকিস্তান স্থষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষক শ্রেণী আক্রমণ করেছে বাংলার মানুষকে, বাংলার সংস্কৃতিকে, সংস্কৃতির বাহন ভাষাকে, সবার ওপরে বাংলার বাংগালীত্বকে। পাকিস্তানের জন্ম লগ্নেই ক্ষমতা আত্মসাৎকারী শোষকশ্রেণী বুঝেছিলো বাংলা দেশে তাদের শোষণকে অব্যাহত রাখতে হলে বাংগালীর সংস্কৃতিকে বিকৃত করে দিতে হবে, তার ভাষার বিকাশকে রুদ্ধ করতে হবে, তার জাতীয়তাবোধকে করে দিতে হবে নিশ্চিহ্ন। সুতরাং শোষকশ্রেণীর রূপ যখুনি বাংলার মানুষের চোখে ধরা পড়তে শুরু করলো, যখুনি বাংলার যুবকেরা লুণ্ঠনকে রোধ করবার জন্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হতে চললো, ঠিক তখুনি পাঞ্জাবী শোষকশ্রেণী আক্রমণ করলো বাংলার সংস্কৃতিকে,—তার ভাষাকে।

সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ ও প্রতিরোধ

ভাষা শ্রমের ফসল। মানুষের প্রয়োজনে ভাষার সৃষ্টি। ভাষার বিকাশ যেমন শ্রমজীবী মানব-সমাজের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি ভাষার বিকাশ শ্রমজীবী মানব-সমাজের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জাতিগঠনে ভাষা অন্যতম প্রধান উপাদান। ভাষার মাধ্যমেই একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, হাসি-আনন্দ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে; একটি জাতি তার সত্তাকে উপলব্ধি করে,—পরস্পরের নৈকট্য উপলব্ধি করে নিজেদের সংগঠিত করে। জাতির বিকাশ সাধনে ভাষার অবদানের গুরুত্ব বোধ হয় সবচাইতে বেশী। ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পাকা দাবা-খেলোয়াড় পাকিস্তানী শাসক-চক্রের এ জ্ঞানটুকু পুরোপুরিই ছিলো।

পাকিস্তানের শাসক-চক্রের জ্ঞান দুটো বিষয়ে অন্তত অত্যন্ত পরিষ্কার ছিলো। প্রথমতঃ, তারা বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে; এবং সে বিদ্বেষ-বিষ সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বিষ। মুসলীমলীগ ব্রিটীশ-বিরোধী সংগঠন হিসেবে কখনও তার পরিচয় সুস্পষ্ট করে তোলেনি। তারা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোন আহ্বান কখনও জানায়নি, কিংবা বিদ্রোহের পরিকল্পনা রচনা করেনি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্য-বাদকে মুসলীমলীগ কখনও মুসলিম জনতার প্রথম ও প্রধানতম শত্রু বলে চিহ্নিত করেনি। তারা তাদের বক্তব্যে এবং আলোচনায় সর্বদাই প্রথম ও প্রধানতম শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিলো হিন্দু-ধর্মাবলম্বী তাদের প্রতিবেশী ভাইদের। বাংলাদেশে ছিলো বড় বড় হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মহাজন। আর বাংলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছিলো দরিদ্র কৃষক প্রজা। এরা ছিলো বড় বড় হিন্দু জমিদার এবং মহা-জনদের লুণ্ঠনের শিকার। দরিদ্র মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের কোন সামাজিক status ছিলো না। অর্থনীতির দিক থেকে দুর্বলতম এই

মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় সামাজিক দিকে অনেকটা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত ছিলো। দরিদ্র মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বড় বড় হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের সামাজিক অবজ্ঞা ও অবিচার এবং অর্থনৈতিক শোষণ ছিলো প্রত্যক্ষ। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ছিলো পরোক্ষ। শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষিত অনুন্নত এই মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক দাবার বড়ে হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলো মুসলিম লীগের ধুরন্ধর ব্রিটীশ তাঁবেদার নবাব-নাইটেরা। মুসলিম জনতার কাছে রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত না করে, তারা প্রচার করলো সাম্প্রদায়িকতা—বললো ঃ হিন্দু মুসলমানের শত্রু ; ছড়ালো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। যখন ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যখন গান্ধীজীর 'Quit India' ভারতের মানুষকে উদ্বেলিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে, যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সামরিক শক্তি ভারতের পূর্ব দুয়ারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, যখন নেতাজী দিবস, শাহনওয়াজ দিবস, নৌবিদ্রোহ দিবসে মহামিলনের মোহনায় দাঁড়িয়ে সংগ্রামী ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত, তখন মুসলিম লীগ Direct Action Day ঘোষণা করে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাংগা বাধিয়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তে ভারতের মাটি কলংকিত করলো। ভারতবাসীর সাম্প্রদায়িক চেতনাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলে উচ্চগ্রামে পৌঁছে দিলো। Direct Action Day-এর লক্ষ্য হলো না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, Direct Action Day-এর নিশানা হলো মুসলমানদের সাধারণ হিন্দু প্রতিবেশী, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সহ-যোদ্ধা। মুসলীম লীগ নেতৃত্বে বিশ্বাসী ভারতের মুসলমান বাস্তবক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোদ্ধা না হয়ে হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামী চেতনার প্রতিবন্ধক। ভারতের মুসলমান হলো এক অশুভ চক্রান্তের

শিকার এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ অশুভ সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষ অংগে মেখে জন্ম নিলো পাকিস্তান রাষ্ট্র। কিন্তু অসুস্থ অশুভ চেতনা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বাংগালীর শুভবুদ্ধি তার অশুভ চেতনাকে একদিন বিসর্জন দেবেই, যদি তার সংস্কৃতি, তার কৃষ্টিতে মংগলের বাণী ধ্বনিত হয়; যদি তার সংস্কৃতির স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশ লাভ ঘটে, এবং যেদিন বাংগালীর মোহমুক্তি ঘটবে, সেদিন সে তার প্রকৃত শত্রুকে সঠিকভাবে চিনে নেবে; তার অস্ত্রকে উত্তোলিত করবে তার শত্রু—লুণ্ঠনকারীর বিরুদ্ধে। সুতরাং লুণ্ঠনকে যদি অব্যাহত রাখতে হয়, যদি শোষণের রথচক্রকে গতিশীল রাখতে হয়, তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাংগালীর সংস্কৃতিব সুস্থ ক্রমবিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়া। ভাষা সংস্কৃতির বাহন, সংস্কৃতির বিকাশের প্রধানতম উপাদান। তাই প্রথম আক্রমণ এলো বাংগালীর ভাষার ওপর—বাংলা ভাষাব ওপর।

দ্বিতীয়তঃ, বিভক্ত বাংলাব এক পারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। এপার বাংলা ওপাব বাংলায় এক ভাষা চালু থাকলে, বাংগালী জাতীয়তাবোধ একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যার ফলে লুণ্ঠনকারীদেব শোষণের স্বর্গ হবে বিধ্বস্ত। সুতরাং এপার বাংলার সাথে ওপাব বাংলাব নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। বাংগালী মুসলমানকে উর্দু ভাষার হেকিমি দাওয়াই খাইয়ে মুসলমান করতে হবে; আরবী হরফের জমজম কূপে ধুয়ে বাংলা ভাষাকে পূত পবিত্র করতে হবে—ইমানদারের ভাষারূপে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি দুই বাংলার নাড়ীর যোগ ছিন্ন করে সম্প্রদায়িকতার বিষকে সক্রিয় রাখতে হবে; বাংগালীর সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনাকে করে রাখতে হবে বিষ-জর্জরিত। সুতরাং বাংলা ভাষার বিকাশকে বন্ধ করো যে-কোন উপায়েই হোক। পাঞ্জাবী কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখপাত্র, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই ষড়যন্ত্র যজ্ঞের অন্যতম যাজ্ঞিক। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে তিনি

করাচীতে গণপরিষদে ঘোষণা করলেন, "পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।"

উর্দুর সন্তান (বাংলা দেশের নয়) খাজা নাজিমুদ্দীন তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বললেন, "আমি বিস্মিত যে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া পূর্ব বাংলার কেউ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে দাবী করে না।"

প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। হরতাল, বিক্ষোভ, সভা, শোভাযাত্রা, পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ। লাঠি চার্জে আহত হলো নিরীহ শোভাযাত্রীরা। এমনকি শেরে বাংলা ফজলুল হকের দেহেও লাঠির আঘাত পড়েছিলো। গ্রেপ্তার হলেন অনেকে। কিন্তু জনতার মারমুখী আন্দোলনের কাছে আংশিক নতি স্বীকার করলেন উর্দুভাষী মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন। বিধান সভায় প্রস্তাব পাশ করে বাংলাকে উর্দুর সমান মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করলেন।

আপাততঃ পিছু হটে গেলো বাংলাদেশে পাঞ্জাবী শোষক-চক্রের স্বার্থ রক্ষাকারী অনুচরেরা। কিন্তু পিছু হটলো তারা সাময়িকভাবে, শুধু মাত্র তীব্রতর আক্রমণের উদ্দেশ্যে।

এবার আসরে নামলেন মুসলিম লীগের যাদুকর স্বয়ং জিন্নাহ্।

১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন জিন্নাহ্। এক সময়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"

"না, না, না"—জিন্নাহ্‌র মুখের ওপর একরাশ প্রতিবাদ ছুঁড়ে মারলো সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা।

ক্রোধে, ক্ষোভে সমাবর্তন সভা ত্যাগ করলেন জিন্নাহ্। যাওয়ার আগে স্পষ্ট উপলব্ধি করে গেলেন, শোষক-চক্রের

শিকার হতে বাংগালী রাজী নয় এবং যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে তারা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করবে।

জিন্নাহ্ তখন পাকিস্তানে জনপ্রিয়তার উত্তুংগ শিখরে। তাঁর জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে পাঞ্জাবী শোষক-চক্র কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলো। কিন্তু চরমভাবে ব্যর্থ হলো তারা। জিন্নাহ্‌কে ম্লান মুখে ফিরে যেতে হলো করাচীতে।

জিন্নাহ্ ফিরে গেলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র বন্ধ হলো না। চেষ্টা চললো 'কুফরী জবান' বাংলাকে উর্দু-আরবীর লেবাছ পরিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করার। প্রস্তাব এলো ভাষা বাংলায় থাক, তবে আরবী হরফে তাকে পবিত্র করে নাও। এছাড়া আরবী-উর্দু-ফারসী শব্দের বল্গাহীন সংমিশ্রণে বিচিত্র সংকব ভাষা সৃষ্টিব প্রয়াস চললো। 'মাহেনও' নামে নতুন মাসিক পত্রিকা চালু করা হলো সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায়। তাতে চললো জগাখিচুড়ীব বিচিত্র প্রয়াস। একটি উদাহবণ ঃ

"মীর সাহেব ফবমাইলেন যে, তাঁহার তবিয়ত বহুত খারাব হইয়াছে। আমি তাঁহাকে দাওয়াই এস্তেমাল করিবার আরজ করিলে, তিনি ফরমাইলেন, "জেবাসা বোখার। দাওয়াই এস্তেমালের জরুরত নাই।"

কিন্তু এভাষা না হলো শ্যামা কল্যাণী, না হলো উর্দীপরা সিপাহী। এ যেন ঘরের লক্ষ্মীকে কিমা চাপিয়ে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে, হাতে লাঠি দিয়ে, সং সাজিয়ে সদর দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয়ার এক হাস্যকর অপপ্রয়াস। বাংলা দেশের বিদ্বজ্জন ঘৃণাভরে এ অপপ্রয়াসকে প্রতিরোধ করলো তাদের সুস্থ লেখনী চালনায়, কাগজে-কলমে, চিন্তায় এবং বইয়ের পৃষ্ঠায়।

এর পর বাহান্ন-র ইতিহাস। মাঝে ভাংগা আসরে লাঠি ঘোরাতে চেষ্টা করেছিলেন ১৯৪৮ সালে ২৭শে নভেম্বরে লিয়াকত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জনসভায়। কিন্তু

'উর্দু' একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে—একথা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সংগে সংগে মাঠের অধিকাংশ শ্রোতার পকেট থেকে কালো রুমাল বের হয়ে লিয়াকত আলী খান সাহেবের গৌর মুখখানিকে কালো করে দিয়েছিলো।

বায়ান্ন সালে শাসকগোষ্ঠী শেষ চেষ্টা করলো। এবার সার্কাসের খেলোয়াড় খাজা নাজিমুদ্দিন। লিয়াকত আলীর হত্যার পর তিনিই তখন প্রধানমন্ত্রী। ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে জনসভায় জিন্নাহ্‌র ঢং-এ খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করলেন, "উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো বাংলার মানুষ। ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা, সভাশেষে মিছিল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ধর্মঘট, বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসভা, জনসভা শেষে মিছিল। বার লাইব্রেরীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দলের সভা বসলো। প্রতিটি দল থেকে দু'জন দু'জন করে নিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হলো। তৈরী হলো কর্মসূচী। ঘোষণা করা হলো ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, মিছিল। প্রস্তুতি চললো। ১১ই, ১২ই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস ঘোষণা করে অর্থ সংগ্রহাভিযান পালিত হলো।

২০শে ফেব্রুয়ারী। ক্ষিপ্ত মুসলিম লীগ সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করলো। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের বেড্ খালি করে দেওয়া হলো। সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হলো শাসক-চক্র পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে। এদিকে সন্ধ্যার পর সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির বৈঠক বসলো। রাজনৈতিক নেতারা পিছিয়ে গেলেন। নির্বাচন তাদের প্রয়োজন; সংগ্রাম আপাততঃ মূলতবী থাক। ১১৪ ধারা ভংগ করলে ব্যাপক হাংগামা হবার সম্ভাবনা। সে অজুহাতে মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচন করা বন্ধ করে দেবে। সুতরাং ১৪৪ ধারা ভংগ করা

চলবে না। প্রতিবাদ করলেন যুবলীগের সভাপতি মোহম্মদ তোয়াহা এবং সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ। ভোটাভুটি হলো। ১১—৪ ভোটে ১৪৪ ধারা অমান্য না-করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। তোয়াহা, অলি আহাদ ভোটে হেরে গেলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে তোয়াহা, অলি আহাদ সহ যে চারজন ১৪৪ ধারা ভংগ করার পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা দিতে পারবেন না এবং সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে যদি ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা ভংগ করেন, তবে সবদলীয় কর্ম পরিষদ স্বাভাবিক ভাবেই সংগে সংগে বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে। অদ্ভুত একটি সিদ্ধান্ত। এ ধরণের গণস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের নজীর ইতিহাসে খুব ক্বচিৎ পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তে শুধু মাত্র সক্রিয়ভাবে ১৪৪ ধারা ভংগের বিরোধীতাই করা হলো না; সংগ্রাম কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিকে যেমন সংগ্রামী ছাত্র-জনতাকে ভীতি প্রদর্শন করে নিরস্ত করবার চেষ্টা করা হলো, অন্যদিকে সরকারী আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে রাজনৈতিক নেতারা সংগ্রামী জনতাকে নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় স্বৈরাচারের আক্রমণের মুখোমুখী রাস্তায় ছেড়ে দিলেন।

রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নেতারা পিছিয়ে গেলেন, কিন্তু কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শনই সংগ্রামী ছাত্র-যুবকদের পিছু হটাতে পারলো না। বিভিন্ন হলে প্রস্তাব পাশ হলো ১৪৪ ধারা অমান্যের পক্ষে। রাত ১টায় ঢাকা হলের পুষ্করিণীর পূর্ব ধারের সিঁড়িতে বৈঠক বসলো এগারো জন ছাত্রনেতার। কয়েক মিনিটের বৈঠক। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঃ ১৪৪ ধারা ভাংগতে হবে। বাংলা ভাষার ওপর এই ঘৃণ্য হামলাকে রুখতে হবে। যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ছোট্ট একটি কর্মসূচী তৈরী হলো।

২১শে ফেব্রুয়ারী। বাংলাদেশের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় দিন। ঐ দিনটিতে ঢাকার বুকে বাংগালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রস্তর সংস্থাপিত হলো। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ঢাকার বীর ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। গ্রেপ্তার হলেন অনেকে। নিরীহ সত্যাগ্রহী। হঠাৎ লাঠি চার্জ, সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া কাঁদুনে গ্যাস ছোড়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে। নিরীহ সত্যাগ্রহীর ধৈর্যের বাঁধ ভাংলো এবার। উত্তাল হয়ে উঠলো জনতা তরংগ। লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, বুলেট, বেয়নেট ভ্রূক্ষেপ নেই। এগিয়ে চললো জনতা। সেদিন ফাল্গুন মাস। ঢাকার রাস্তার দুধারে লাল কৃষ্ণচূড়ার ছড়াছড়ি। কৃষ্ণচূড়ার লালের ছোপ লেগেছে ঢাকার মাটিতে। সে-রং এ-রং মিলিয়ে বুকের রক্তে কালো পীচঢালা রাজপথ আরো লাল করে দিয়ে গেলো বরকত, সালাম, রফিক, জোব্বার। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শক্তির দম্ভে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলো বাংলা ভাষার দাবীকে। বাংলার মানুষ তীব্র ধিক্কারে, সীমাহীন ঘৃণায়, প্রতিরোধের অমোঘ অস্ত্রে সে ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলো, বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলো বাংলাকে; বপন করলো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বুকের ওপর বাংগালী জাতীয়তাবাদের বীজাঙ্কুর; বাংলাদেশের ইতিহাসে রচনা করলো এক যুগান্তকারী অধ্যায়। সেদিন পূর্বাকাশে যে নতুন সূর্য দেখা দিলো তারই রশ্মি ক্রমে দিগন্ত উদ্ভাসিত করলো। আজকের স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই মহান রক্তরাঙা একুশের প্রতিরোধ সংগ্রামেরই ক্রমবিকাশ। আদর্শের জন্যে, কল্যাণের জন্যে, সত্যের জন্যে, সেদিনের সে আত্মবিসর্জন আজ গৌরবে ভাস্বর হয়ে অপূর্ব দীপ্তিতে পরিণত রূপ নিয়েছে।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হলো। সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হলো। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশ ও বাংগালী

জাতির প্রথম বিজয়লাভ। রক্তের স্বাক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলা জাতীয়তাবাদের প্রথম সিঁড়ি।

সংবিধানে বাংলার দাবী স্বীকৃত হলো বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা হাল ছেড়ে দিলো না। নিত্যনতুন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের জাল বুনে চললো। সংবিধানে পূর্ব-বংগের নামটি পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দেয়া হলো। পূর্ব-বংগ নামের ইসলামী সংস্করণ হলো পূর্ব-পাকিস্তান। ভাষার ঐক্যবোধকে ধ্বংস করতে হবে, বিচ্ছিন্ন করতে হবে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র। সুতরাং বাংগালী তার দেশ বাংলার নাম হারালো। শ্যামলী বাংলা মায়ের নীলাম্বরী শাড়ী কেড়ে নিয়ে তাকে পায়জামা, কামিজ আর ওড়না পরানো হলো। সংস্কৃতি হনন-প্রচেষ্টার এ ধরনের নিষ্ঠুরতম নিদর্শনের নজীর ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ। বিদ্বেষের বীজ, সাম্প্রদায়িকতার নারকীয় উস্কানীর ব্যবস্থাও রইলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে। সংবিধানে গ্রথিত হলো পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত হবে, আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতিরেকে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকের পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হবার অধিকার থাকবে না। বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্যতম নিদর্শন সংযোজিত হলো রাষ্ট্রীয় সংবিধানে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে জিন্নাহ্‌র ঘোষণা—"আজ থেকে রাজনীতিতে হিন্দু হিন্দু নয়, মুসলিম মুসলিম নয়, শুধু বিরাট এক মহাজাতি" আস্তাকুঁড়ের আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতার এ নির্লজ্জ অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে শোষক শ্রেণীর গত্যন্তর ছিলো না। শোষণকে নিরংকুশ রাখার জন্যে মুক্তিকামী মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার গোলকধাঁধায় নিক্ষেপ করে, তার সুস্থ চিন্তাকে হনন করার জন্যে এইটেই ছিলো শোষক শ্রেণীর একমাত্র হাতিয়ার। বাংলার মানুষ যখুনি তার স্বাধিকারের দাবীতে সংগ্রামে নেমেছে, তখুনি তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এই হাতিয়ার।

সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পেল বটে, কিন্তু জাতীয়

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হলো না। সুতরাং এবার আরম্ভ হলো অফিস আদালত, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ডাকটিকিটে, মুদ্রায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার দাবীতে সংগ্রাম। 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করো'—কোটি কণ্ঠের বজ্রমুখর ধ্বনি। এই দাবীকে প্রতিহত করবার মতো শক্তি পাঞ্জাবী শোষকচক্রের ছিলো না। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে নতি স্বীকার করতে হলো কায়েমী স্বার্থবাদীদের শক্তির দম্ভকে। মুদ্রায় বাংলা ভাষার প্রচলন হলো। গাড়ীর নম্বর বাংলায় লেখা হলো। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ভাষার সংগ্রামে বাংলার মানুষের সর্বাত্মক জয় হলো। কিন্তু সুযোগ পেলেই শোষকশ্রেণী বাংলাব সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ চালাতে কসুর করলো না। আইয়ুবের ইসলামাবাদে নববর্ষ ১লা বৈশাখকে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দেয়া হলো। ধর্মীয় দোহাই দিয়ে বাংলার সংস্কৃতির ফসল—শ্যামা সংগীত, ভজন, কীর্তন রেডিওতে পরিবেশন নিষিদ্ধ হলো। রেডিওতে রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন বন্ধ করবার একটা প্রচেষ্টা পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর বরাবরই ছিলো। ১৯৬০ সালে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের জন্যে অনেক সরকারী কর্মচারী এবং কলেজের শিক্ষকদের কৈফিয়ত দিতে হয়। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্র জয়ন্তী মহা-আড়ম্বরে প্রতিপালিত হতে লাগলো প্রতি বছর। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো শাসকশ্রেণী; সুযোগ তাদের মিললো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষকালে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-সংগীতকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হলো। অপরাধ? অপরাধ রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়; অপরাধ রবীন্দ্রনাথ অমুসলমান। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের মুষলাঘাতে সাময়িক ভাবে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো বাংলার বুদ্ধিজীবী মানুষ। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটি দিন। ১৯৬৬ সালেই বাংলার মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অবিমৃষ্যকারিতাকে তীব্র ধিক্কার দিলো। আবার

চালু হলো রবীন্দ্র সংগীতের কর্মসূচী। কিন্তু পাঞ্জাবী শাসকচক্র সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। ১৯৬৭ সালেই বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নোতুন আঘাত হানলো পাঞ্জাবী শাসকচক্র। রেডিও থেকে রবীন্দ্র সংগীত নির্বাসিত হলো। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী উর্দুভাষী খাজা শাহাবুদ্দীন ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান রেডিও থেকে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন বন্ধ করার হুকুমনামা জারী করলেন। সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তান সরকারের এই নির্লজ্জ হামলার বিরুদ্ধে এবার রুখে দাঁড়ালো বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ্, বিজ্ঞানী, ছাত্র-জনতা। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো সারা বাংলাদেশের মানুষ। শাহাবুদ্দীনের অর্বাচীন হুকুম-নামার তীব্র নিন্দা করে যুক্ত বিবৃতি বের হলো। তাতে স্বাক্ষর দিলেন, ডক্টর কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিল্পী জয়নুল আবেদীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যক্ষ ডঃ আব্দুল হাই, ডক্টর আনিসুজ্জামান, কবি শামসুর রহমান এবং আরো অনেকে। প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ আর মিছিলে কেঁপে উঠলো বাংলার মাটি। এ তো শুধু প্রতিবাদ নয়, এ-যে বাংলার বুকে রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠার মহোৎসব। শাসক-চক্রের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠান, রবীন্দ্র নাট্যানুষ্ঠান, রবীন্দ্র প্রতিভা আলোচনা, রবীন্দ্র পাঠ, রবীন্দ্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনে বাংলার মানুষ মেতে উঠলো। সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বললেন, "ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিরাজমান।" অবিভক্ত বাংলার মুসলীম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম তীব্র ধিক্কার দিয়ে বললেন, "যারা রবীন্দ্রনাথকে ইসলাম-বিরোধী বলে, তারা ইসলাম বোঝে না। বিশ্ব-মানবতাবোধ যদি ইসলাম-বিরোধী না হয়, তবে রবীন্দ্রনাথকে ইসলাম-বিরোধী বলা মূর্খতা মাত্র।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডক্টর মোফাজ্জল হায়দার বললেন,

"কবিগুরু আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছেন। বিশ্বকবি আমাদেরও কবি।" সেদিন বাংলার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রজনতা এককণ্ঠে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে পদ্মা, যমুনা, মেঘনাকে যেমন নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায় না, তেমনি বাংলাদেশেব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বুকেব রক্ত ঢেলে বাংলাদেশের তরুণরা যে বাংলা ভাষার গৌরব ও মর্যাদাকে রক্ষা করেছে, সেই বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথকে পৃথক সত্তায় বিভক্ত করা যায় না।" ববীন্দ্র-প্রতিভা বাংলা ভাষার গৌরব, বাংলা সংস্কৃতির গৌরব, বাংলাদেশের গৌরব। ববীন্দ্রনাথ বাংলার কবি—বাংগালীর কবি—বাংলা দেশের জাতীয় কবি। সেদিনের বাংলার মানুষের কঠিন সংগ্রাম জয়যুক্ত হলো। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের প্রসাবিত খড়্গহস্ত হাব মেনে লজ্জায় আশ্রয় নিলো বস্ত্রান্তবালে। বাংলার মানুষ বহুমূল্য দিয়ে জাতীয় জীবনে তার আপন কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা করলো। রবীন্দ্রনাথ হলেন বাংলা দেশের জাতীয় কবি। তাঁর গান "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"—আজ বাংলার ঘরে ঘরে গীত হচ্ছে।

এমনিভাবে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীরা বারবার তাদের স্বার্থের বেদীমূলে বাংলার মানুষের ভাষাকে, বাংলার সংস্কৃতিকে বলি দিতে চেয়েছে; টুটি চেপে, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন, কিন্তু বাংগালী জনতার মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখে বার বার পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়েছে; সাম্প্রদায়িকতার তীব্র হলাহলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপর্যস্ত ধিকৃত করতে চেয়েছে; কিন্তু বাংলার মানুষের সুস্থ জীবন-চেতনা তাদের সে সমস্ত ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে নির্মমভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ধর্মের জিগীর তুলে বাংলার সংস্কৃতিকে করতে চেয়েছে খঞ্জ, পংগু, বিকলাংগ, বীভৎস, বিকৃত; বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তা-বোধ প্রতিরোধের কঠিন দুর্গ গড়ে

তুলে, সে আক্রমণকে প্রতিহত করেছে, নস্যাৎ করে দিয়েছে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোতে পাকিস্তানে নিষ্ঠুর বঞ্চনা বাংলার মানুষকে এ শিক্ষা দিয়েছিলো—"কলেমা পড়ে একজন হিন্দু, অথবা খৃস্টান কিংবা বৌদ্ধ মুসলমান হতে পারে এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের একজন বলে দাবীও করতে পারে। কিন্তু ধুতি, পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে, গায়ে চাদর জড়িয়ে, বাংলা ভাষায় কথা বলে একজন পাঞ্জাবী যেমনি বাংগালী সাজতে পারে না, তেমনি জিন্নাহ্ টুপী, শিলওয়ার পরে, কিংবা মাথায় পাগড়ী বেঁধে, উর্দুর এলেম হাসিল করে, একজন বাংগালী কখনও পাঞ্জাবী বনে যেতে পারে না। পাঞ্জাব হলো পাঞ্জাব, আর বাংলা হলো বাংলা,—দুই দেশ—দুই মন—দুই জাতি।"

[শিল্পী কামরুল হাসান কর্তৃক বগুড়া করতোয়া সাংস্কৃতিক সংসদে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে]।

কারণ বাংলার মানুষ উপলব্ধি করেছিলো তার সাংস্কৃতিক অন্দোলন, তার রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিভূমি। সেজন্যে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে রবীন্দ্র বর্জন প্রতিরোধ আন্দোলন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নিয়েছে, রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলম আর রাজনৈতিক সংগ্রাম মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, দুয়ে মিলে সংগ্রাম প্রতিদিন বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর হয়েছে; শক্তির দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে অবশেষে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের উচ্চগ্রামে পৌঁচেছে।

চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম

সাম্প্রদায়িকতার বিষ শাসকচক্রের হাতিয়ার। এর হাত থেকে রেহাই না পেলে কল্যাণ নেই; নেই শোষিত মানুষের মুক্তি। পাকিস্তানের জন্মলগ্নের পরপরই বাংলা দেশের নবজাগ্রত যুবসমাজ এ কঠিন সত্য হৃদয়ংগম করলেন। সুতরাং স্বাধীনতা উত্তরকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তাব উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৭ সালের ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের যুবকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হলো। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সামসুল হক বললেন, "এমন একটি কর্মপন্থা স্থির করা, যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের সকল হিন্দু-মুসলমান যুবক বর্তমান অবস্থায় তাহাদের কর্তব্য বুঝিয়া আজাদ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুখী, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধশালী আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইতে পারেন।" এই সম্মেলনের ইস্তাহারে স্পষ্টভাবে দাবী করা হয়, "রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকার পৃথক পৃথক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশকে সরকার স্বীকার করিয়া নিবেন। জীবন ও সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে এই সব এলাকার সকল ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইতে হইবে।" সম্মেলন শেষে ২৫ জন সদস্য নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হলো। এ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন—তসদ্দুক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহমদ, সামসুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, অলি আহাদ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক শিবিরের একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মিবৃন্দ। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে মুসলিম লীগের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা হামলা চালায় এবং সম্পাদক সামসুল হককে প্রহার করে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই প্রথম নগ্ন আক্রমণ। যদিও গণতান্ত্রিক যুবলীগের উৎসাহ উদ্দীপনা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, তথাপি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সংগঠনের একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করা যায়। কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই প্রথম বাংলাদেশের জাগ্রত যুবসমাজ জাতিকে সাম্প্রদায়িকতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিদানের জন্যে সচেষ্ট হন।

গণতান্ত্রিক যুবলীগ সংগঠন হিসেবে দাঁড়াতে পারলো না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিকামী ছাত্রসমাজ নোতুন সংগঠন গড়ে তুললো। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু-সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্র একটি নোতুন ছাত্র-প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হলেন। এই প্রতিষ্ঠানই 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক ইস্তাহারে বলা হলো, "রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা যেন স্থান না পায়, তজ্জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং নূতন নোট, স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড, মণিঅর্ডার ফর্ম, মুদ্রা ও অন্যান্য জিনিস হইতে সমস্ত পাকিস্তানের জনসাধারণের অধিকাংশের ভাষা বাংলাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের নৌবাহিনী পরীক্ষায় উর্দুতে টেস্ট করিবার ছলনায় পূর্ব-বাংলার যুবকদের বাদ দেওয়া হইতেছে। ইংরাজীর পরিবর্তে উর্দুর জুলুম আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিকদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হইতেছে।"

ওপরের ইস্তাহারটি পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা বাংলাদেশকে বঞ্চনা-প্রচেষ্টার প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত বাংলার জাগ্রত ছাত্রসমাজের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নানা কারণে এই ছাত্র প্রতিষ্ঠানটিকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়া সম্ভবপর হয়নি। সাম্প্রদায়িক নামকরণের জন্যে জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এই প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। এই ছাত্র-প্রতিষ্ঠান সেদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ

গ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব দান করে। প্রকৃত পক্ষে এ সময়টি ছিলো ভবিষ্যতের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা এবং প্রস্তুতির যুগ।

এর পরপরই ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন। পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীরা গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ করে এবং পুলিশের বুটের তলায় ভাষা আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইলো। গ্রেফতার করা হলো শেখ মুজিবর রহমান, সামসুল হক, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন এবং আরও অন্যান্যদের। তোয়াহাকে প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করা হলো। গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়া হলো নিরীহ ছাত্রদের ওপর। কিন্তু ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখে নতি স্বীকার করতে হলো স্বৈরাচারী সরকারকে।

বন্দীদের মুক্তি দেয়া হলো ১৫ই মার্চ। প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের চাপে নাজিমুদ্দীন আট দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। চুক্তিপত্রের অষ্টম দফায় স্বহস্তে লিখলেন, "সংগ্রাম পরিষদের সংগে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশ্‌মনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।" স্বৈরাচারী সরকারের মিথ্যা প্রচারণা ও প্রচণ্ড দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেদিন বাংলার মানুষের প্রথম বিজয় সূচিত হলো। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বংগবন্ধু শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে প্রাগ্রসর রাজনৈতিক চেতনা কার্যকরী ছিলো, তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন তারিখে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের জন্ম; কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাংগঠনিক হাতিয়ার পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক দল। মৌলানা ভাসানী সভাপতি, সামসুল হক সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মুস্তাক

আহমদ যুগ্ম-সম্পাদক। মোট ৪০ জনকে নিয়ে সাংগঠনিক কমিটি। আওয়ামী মুসলিম লীগ তার জন্মলগ্নে ঘোষণা করলো, "পাকিস্তানের ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।" দাবী করলো, "প্রাথমিক শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে, যেমন—যুদ্ধশিল্প, ব্যাংক্, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি ও বনজ সম্পদ ইত্যাদি এবং অন্যান্য ছোট-খাট শিল্পগুলিকে পরিকল্পনার ভিতর দিয়া সরাসরি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।" "পাট ও চা-শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং পাট ও চা ব্যবসায় সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকিবে।"

আওয়ামী মুসলীম লীগেব ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-গোষ্ঠীকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। এই শিশু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে গলা টিপে মারার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলো তারা। দমননীতির খড়্গাঘাত নেমে এলো। গ্রেপ্তাব হলেন শেখ মুজিব এবং তাব সংগে আরো অনেকে।

শাসকচক্র যতই গণতান্ত্রিক কর্মীদের ওপব হামলা চালাতে লাগলো, ততই সংঘটিত হতে লাগলো বাংলাদেশের বিদ্রোহী তরুণ ও যুবসমাজ। তোয়াহা, অলি আহাদ, ইমাদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত হলো পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ। একটি শক্তিশালী অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী যুব-প্রতিষ্ঠান। স্বল্পকালের জন্যে হলেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস যুবলীগের অবদানে সমৃদ্ধ। বায়ান্ন-র ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের সংগ্রামশীল ভূমিকা জাতির ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। শুধু তাই নয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনে যুবলীগ যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা অবিস্মরণীয়। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে যেমনি পূর্ব-পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ নেতৃত্ব দিয়েছিলো, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দো-লনের পেছনে ছিলো তেমনি যুবলীগের আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকা। সংগঠন হিসেবে যুবলীগ তখনো একটি বিরাট শক্তিশালী

সংগঠনে পরিণত হয়নি। কিন্তু সঠিক সময়ে যুবলীগের সঠিক নেতৃত্ব বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে সেদিন বাংলা ভাষার দাবীতে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে ছিলো। সেদিন বাংগালীর জাতীয় জীবনে আত্মোপলব্ধির এক শুভলগ্ন। জাতীয়তাবাদের বন্যা ভাসিয়ে দিয়ে গেলো বাংলার জনপদ। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে কী পবিবর্তন এনেছিলো, তার পরিচয় মেলে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

১৯৫৪ সালেব মার্চ মাসে বাংলাদেশ নোতুন ইতিহাস রচনা করলো—বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হলো যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়েব ওপর অধিকাব থাকবে বাংলাদেশের। মাত্র সাত বছরের মুসলিম লীগ শাসনে বাংলার মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলো পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর শোষণের তীব্র জ্বালা, বাংলার দিগন্তে জমে উঠেছিলো পুঞ্জীভূত আক্রোশ। সে আক্রোশ ফেটে পড়লো নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনেব পূর্বে যুক্তফ্রন্টের হাজার হাজার কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। নির্বাচনে মুসলিম লীগ দলপতি মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন তার দলবল-সহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফল দেখে মনে হয়—এ যেন নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের এক জাতীয় উত্থান।

১লা এপ্রিল তারিখে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। বাংলাদেশের মানুষের মনে এক নবজাগ্রত জাতীয় উন্মাদনা 'দেশকে গড়ে তুলবো।' কিন্তু নির্বাচনের সার্বিক পরাজয় শাসকগোষ্ঠীকে রীতিমতো বিচলিত করে তুলেছিলো। গণতন্ত্রের সামান্যতম স্ফুরণ তাদের শোষণের দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে।

সুতরাং বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করার ওপর যাদের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল, তারা যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে উঠলো। মে মাসের মধ্যভাগে চক্রান্তকারীরা পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি আদমজীর নারায়ণগঞ্জের শিল্প-কারখানায় বাংগালী-অবাংগালীর মধ্যে দাংগা বাধিয়ে দিলো। রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিলো শীতলক্ষ্যার তটভূমি। দাংগা বাধালো তারা চন্দ্রঘোনা মিলে। যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীরা ছুটলেন। অবস্থা আয়ত্তে এলো যাদুমন্ত্রের মতো। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা দমবার পাত্র ছিলো না। ২৫শে তারিখে নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এসে জুড়ে-বসা প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভেংগে দিলেন। ৯১ (ক) ধারা মতে গভর্নরের শাসন জারী হলো। কয়েক সহস্র রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলো আরও কয়েক সহস্র কর্মীর বিরুদ্ধে। মওলানা ভাসানী তখন ইউরোপে। মীরজাফরের বংশধর স্বরাষ্ট্র সচিব ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করলো, "মওলানা ভাসানী যদি কখনও দেশে ফেরে, তাহলে তার একজন হাবিলদার মওলানা ভাসানীকে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করবে।"

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী ভেবেছিলো দমননীতির ষ্টীম রোলার চালিয়ে তারা বাংলার মানুষের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু মিথ্যে প্রমাণিত হলো তাদের সমস্ত হিসেব। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বাংলার অমর জনতা ১৯৫৫ সালের ভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার দাবীতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুললো। শাসকচক্রের রক্ত আঁখিকে উপেক্ষা করে গোটা বাংলার মানুষ স্বৈরাচারী শাসনের অবসান দাবীতে টেকনাফ থেকে শুরু করে তেতুলিয়া পর্যন্ত যে আপোষবিহীন সংগ্রামের সূচনা করলো, তাতে শাসকগোষ্ঠী ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো। এভাবে বাংলার মানুষ বার বার আঘাত খেয়েছে, আঘাত খেয়ে সাময়িক-ভাবে পিছু হটেছে, পরে শক্তি সঞ্চার করে প্রত্যাঘাত করেছে;

প্রত্যাঘাত করে শাসকচক্রের স্পর্ধিত উদ্ধত মাথাকে নুইয়ে দিয়েছে। এইটিই বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস নাটকীয়, রোমাঞ্চকর, এবং পরিশেষে জয়ের ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান।

এবার মন্ত্রিসভা গঠন করলেন আবু হোসেন সরকার। মাত্র কয়েকদিন আগে যে শেরে বাংলা ফজলুল হককে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী 'বিশ্বাসঘাতক', 'দেশদ্রোহী' বলেছিলেন, তিনি হলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র সচিব। কেমন করে এ সম্ভব হলো? এ প্রশ্নের উত্তর শুধু মাত্র একটি। ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে সবই সম্ভব। যে রাজনীতি দেশপ্রেমবিহীন, ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠিস্বার্থে নিয়োজিত, সে রাজনীতিতে সবই সম্ভব। 'দেশদ্রোহী' ফজলুল হক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হতে পারলেন, কারণ পাঞ্জাবী শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল হয়ে গেছে, যুক্তফ্রন্ট গেছে ভেংগে, বাংলার জাগ্রত জনতা রাজনীতির দলীয় কোন্দলে দিশেহারা, বিভ্রান্ত; সুতরাং শোষকগোষ্ঠীর শোষণ ক্ষেত্রের দ্বার হয়েছে উন্মুক্ত, অবারিত।

১৯৫৫-১৯৫৬ সাল বাংলা দেশের রাজনীতি বিশেষ তাৎপর্যে পূর্ণ। ঐ সময় একদিকে বাংলার রাজনীতিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক জামাতে-ইসলাম দলের আবির্ভাব ঘটলো, অন্যদিকে মওলানা ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলীম লীগ তার নাম থেকে 'মুসলীম' শব্দটি কেটে দিয়ে এবং যুক্তনির্বাচন ব্যবস্থার আইন বিধিবদ্ধ করে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। প্রকৃতপক্ষে এর পূর্বে বাংলা দেশে গণতান্ত্রিকদল, কৃষক-শ্রমিক পার্টি প্রভৃতি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু মওলানা ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ সেদিন ছিলো বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুষ্ঠু রূপায়নের একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং সাম্প্রদায়িক আওয়ামী মুসলীম লীগের 'মুসলীম' শব্দটি কেটে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার মধ্যে দিয়ে সেদিন বাংলাদেশ তথা

পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে এক নোতুন অধ্যায়ের সংযোজনা হলো।

এর পরই ১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর কাগমারী সম্মেলন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় মুখ্যতঃ দু'টি। এক—বাংলা দেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। দুই—যুদ্ধ-জোটবিরোধী পররাষ্ট্র নীতি—পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিব স্বপক্ষে এক মহান নায়ক, বাংলার শোষিত মানুষের মহান উত্থানের দিশারী, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, ঘৃণার ঊর্ধ্বে উত্তোলিত পতকাবাহী মানবতার মহান নায়ক।

টাংগাইল থেকে কাগমারী পর্যন্ত সড়কে অসংখ্য তোরণ। জিন্নাহ্, ইকবালের নামাংকিত তোবণ সমূহের পাশাপাশি সজ্জিত হোলো মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সূর্য সেন, বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিধান চন্দ্র রায়, লেনিন, আব্রাহাম লিংকন, সেক্সপীয়র তোরণসমূহ। সাম্প্রদায়িকতার হলাহলকে ভিত্তি কবে মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা। কাগমারীতে তোরণ-সজ্জার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা মাওলানা ভাসানী ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবতার অত্যুজ্জ্বল পতাকা সম্মুখে তুলে ধরলেন।

যুদ্ধ-জোট সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানবতার একনিষ্ঠ নায়ক বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "ওরা আমাদের ছেলেদের বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে, তা আমি হতে দেবো না। আমি জান দিয়ে যুদ্ধ জোটের বিরোধিতা করবো। কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর করে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি মানিয়ে নিতে চান, তাহলে আমি কবরে এক পা দিয়ে চিৎকার করে বলবো—না, না, না—আমি ঐ সর্বনাশা যুদ্ধ-জোটকে সমর্থন করি না।"

কাগমারীতে মওলানা ভাসানীর এই ঐতিহাসিক ভাষণ দান কালে তার পাশে বসেছিলেন, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রবক্তা পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। কিন্তু মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করার মতো জোরালো ভাষা তার আয়ত্তে ছিলো না। কিংবা সেদিন মওলানা ভাসানীর সংগে শেষ বোঝা-পড়া করার মতো অবস্থাও তাঁর ছিলো না। অবশ্য সোহ্‌রাওয়ার্দী শেষ বোঝা-পড়া করেছিলেন কয়েকমাস পরে। শেষ বোঝাপড়ায় মওলানা ভাসানীকে কোণঠাসা করতেও পেরেছিলেন। ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দী দ্বন্দ্বে শেখ মুজিব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সমর্থন করেন।

সম্মেলনে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আওয়ামী লীগপ্রধান মওলানা ভাসানী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যদি পূর্ব-বাংলায় তোমরা তোমাদের শোষণ চালিয়ে যাও, যদি বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, তোমরা আমাদের কাছ থেকে একটি কথাই শুনে রাখো—'আচ্ছালামু আলায়-কুম্'—তুমি তোমার পথে যাও, আমরা আমাদের পথে যাবো।"

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পশ্চিমবাংলা থেকে শ্রীহুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন, প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধ কুমার স্যান্নাল প্রভৃতি পশ্চিমবংগের সাংস্কৃতিক জীবনের পুরোধাগণ। কাগমারীর ঐতিহাসিক সম্মেলনে বাংলাদেশের সংস্কৃতিমনা মানুষ এদের সান্নিধ্যে এসে অভিভূত হয়েছিলো, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো। ১৯৪৭ সালের পর এই সম্মেলনেই প্রথম সবার অলক্ষ্যে হৃদয়ের শত উৎস-ধারায় স্নাত হয়ে এক সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচিত হয়েছিলো।

কাগমারী সম্মেলন এক ঐতিহাসিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে একদিকে যেমন যুদ্ধ-জোট, সাম্প্রদায়িকতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী

শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠলো, অন্যদিকে এই সম্মেলনেই আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হবার বীজ উপ্ত হলো। মওলানা ভাসানীর বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক-চক্রকে স্তম্ভিত ও বিচলিত করে তুলেছিলো। মওলানা ভাসানীকে বাংলা দেশের রাজনীতি থেকে অপসারিত করতে না পারলে তাদের স্বার্থ কিছুতেই নিরাপদ নয়। সুতরাং শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত প্রচার-যন্ত্র মওলানা ভাসানীকে ভারতের দালালরূপে চিহ্নিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠলো। এমন কি ঢাকার বিখ্যাত দৈনিক 'ইত্তেফাক'-ও এই অপপ্রচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলো।

কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদের যে বীজ বপন হয়েছিলো, কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিণতি স্বরূপ আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হলো। ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জন্ম নিলো প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ দুটো অংগীকার নিয়ে—(১) পাকিস্তানের জন্যে স্বাধীন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি; (২) বাংলার জন্যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃত্বে বাংলাদেশের মাঠে মাঠে সোচ্চার হয়ে উঠলো পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী। ঐ সময় বাংলা দেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রধান প্রবক্তা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

পশ্চিম পাকিস্তানে তখন এক ইউনিট-বিরোধী মনোভাব প্রবলতর হয়ে উঠেছে। ১৯৫৯ সালে নির্বাচন হবে। বাংলার মানুষ স্বাধিকার চায়; সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ চায় এক ইউনিটের বিলোপ সাধন এবং পুরনো প্রদেশগুলোর পুনঃ-সংস্থাপন। পাঞ্জাবী শাসকচক্রের নাভিশ্বাস উপস্থিত হলো। সুতরাং শোষকগোষ্ঠী নির্লজ্জ এবং নগ্ন হামলা চালালো গণতান্ত্রিক মানুষের ওপর। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতের অন্ধকারে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানে

সামরিক আইন জারী হলো। ইস্কান্দার মীর্জা প্রেসিডেন্ট, আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী। ২৭শে অক্টোবর তারিখে আবার পট পরিবর্তন হলো। এইবার ইস্কান্দারকে চলে যেতে হলো পর্দার অন্তরালে চিরদিনের মতো। আইয়ুব খান হলেন স্ব-বিঘোষিত প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তানে লোক-দেখানো যে গণতন্ত্র চালু ছিলো, এবার তাকেও সম্পূর্ণ মুছে দেয়া হলো পাকিস্তানের বুক থেকে। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলা দেশের কয়েক সহস্র কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হলো। কয়েক শত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হলো। রাজনীতি নিষিদ্ধ হলো। শিল্পপতিদের স্বার্থে শ্রমিক ধর্মঘটকে করা হলো বেআইনী। সুতরাং বাংলা দেশে অবাধ লুণ্ঠন এবং শোষণের দ্বার অবারিত হলো। আয়ুবের শাসনকালে ২২টি পরিবার দেশের ব্যাংকিং-শিল্পের ৮০ ভাগের মালিক এবং লাইফ ইনসিওরেন্স সহ বীমা-শিল্পের ৯৭ ভাগের মালিক হয়ে বসলো। বলা বাহুল্য, এই বাইশটি পরিবারের সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী। কিন্তু এই বাইশটি পরিবারের সম্পত্তির বাইরে যা আছে, তারও অধিকাংশের মালিক হলেন বিদেশী পুঁজিপতিরা। ফলে বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা যে কত শোচনীয় হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়ালো ঢাকার বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ। ১৯৬২ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে আওয়ামী লীগপ্রধান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে আইয়ুব সরকার নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করলো। ফুঁসে উঠলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১লা ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হলো। বিদ্রোহী ছাত্রসমাজের সম্মুখ সারিতে এসে দাঁড়ালেন শেখ ফজলুল হক মণি, কাজী জাফর আহমেদ শাহ, মোয়াজ্জেম হোসেন, রাশেদ খান মেনন, ফরহাদ, মহীউদ্দীন আহমদ, হায়দার আকবর, খান রনো প্রভৃতি। এঁদের নেতৃত্বে ২রা ফেব্রুয়ারী প্রেসক্লাবের সম্মুখে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শিত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে

আইয়ুব খানের মন্ত্রী মঞ্জুর কাদির এসেছিলেন বক্তৃতা করতে, তাকেও চরমভাবে লাঞ্ছিত করা হলো। উত্তেজনা এমন পর্যায়ে গিয়েছিলো যে, একজন ছাত্র আইয়ুবের জনপ্রিয় মন্ত্রী মঞ্জুর কাদিরের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলেছিলো,—'Go, tell your father Ayub, the killer of democracy, that we spit on thy father's face also."

৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌছলো। ছাত্র-বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে সামরিক বাহিনী তলব করা হলো। শুরু হলো রাস্তায় রাস্তায় বিদ্রোহী ছাত্রদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর খণ্ড যুদ্ধ। প্রাণ দিলো বাস কর্মচারী ওয়াজিউল্লাহ্. ছাত্রেরা মিলিটারী লরীতে আগুন লাগিয়ে দিলো। যানবাহন চলাচল বন্ধ। বেগতিক দেখে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

১৯৬২ সালের আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো আগস্ট মাসে। 'শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'-বিরোধী এ আন্দোলন বিশাল ব্যাপকতা লাভ করে। ছাত্রনেতাগণ ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করেন। প্রচণ্ড সরকারী হামলার মুখোমুখী হয়েও বিদ্রোহী ছাত্র-সমাজ পিছিয়ে গেলো না। প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হলো। এই ছাত্র আন্দোলনের প্রতি অভিভাবকেরা জানালো তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। বেগতিক দেখে পিছিয়ে গেলো সরকারী শাসনযন্ত্র। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আপাততঃ গৃহীত হলো না। আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাংলার ছাত্রদের প্রথম বিজয় লাভ। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬২ সালে বাংলার বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ যে আগুন জ্বালিয়েছিলো, ১৯৬৯ সালে এগারো দফা কর্মসূচীর রূপ নিয়ে সে আগুন শত লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত করে দিলো আইয়ুবী শাসনের ইমারত।

ছয় দফা ও স্বাধিকারের সংগ্রাম

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে সংঘর্ষ হলো, তার ফলশ্রুতি স্বরূপ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠীর প্রতিভূ আইয়ুব খান যেমনি একদিকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে নিলো, অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ সমালোচনা-মুখর হয়ে উঠলো। দেশ-রক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্যে বাংলা দেশের প্রতিনিধিরা অবিচ্ছিন্ন ভাবে দাবী করে আসছিলো। বাংলাদেশের এই দাবীর প্রতি সামান্যতম কর্ণপাত করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থবহ সামরিক নায়কগণ। বাংলাদেশের টাকায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে; অথচ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খাতের শতকরা ৯৮ ভাগের বেশী খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে। বাংলাদেশ হয়েছে চরমভাবে বঞ্চিত। যখুনি প্রশ্ন উঠেছে—বাংলার প্রতিরক্ষা কি করে সম্ভব? —তখুনি শাসকগোষ্ঠী নির্বিকার চিত্তে বলেছে—'একমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্রই বাংলাদেশকে রক্ষা করতে সক্ষম।' কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধে তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্র বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এ কথাটির সমর্থন পাওয়া গেল যখন আয়ুবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টো স্বীকার করল—"চীনের জন্যে পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে"। অর্থাৎ শক্তিশালী কেন্দ্র বাংলাদেশের প্রতিরক্ষায় কোন ব্যবস্থাই করেনি, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নির্ভর করেছে অন্যদেশের দয়ার ওপর। এখানে একটি কথা সব বাংগালীই জানে যে, বাংলা দেশ আক্রমণ করার কোন চিন্তা ভারতের ছিলো না। ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করলে ভুট্টো সাহেবের এ বাহাদুরী দেখাবারও অবকাশ মিলতো না।

১৯৬৬ সালে ১৫ই মার্চ জাতীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসংগে নুরুল আমীন বলেন, "তখন পূর্ব-পাকিস্তান শুধু রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি থেকেই বিচ্ছিন্ন ছিলো না, সারা বিশ্ব থেকেই এই প্রদেশ বিচ্ছিন্ন ছিলো। যুদ্ধকালীন এই বিচ্ছিন্নতার আলোকে পূর্ব-পাকিস্তান-বাসীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে, বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানের কোন অংশ নেই।" ইনি সেই নুরুল আমীন যাঁকে দলে ভিড়াবার জন্যে আজও ইয়াহিয়ার সামরিক-চক্রের চেষ্টার কসুর নেই।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারতের যুদ্ধকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা—সামরিক ব্যবস্থায় পূর্ব-বাংলাকে চরমভাবে অবহেলা বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে আরও জোরদার করে তুললো।

১৯৬৬ সালের প্রথম ভাগে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবী পেশ করলেন। ছয় দফার মধ্যে বাংলাদেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকারের দাবী জানানো হলো, তার মুখোমুখি হয়ে আইয়ুব একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বাংলাকে শোষণ করতে না পারলে, বাংলার সম্পদ-লুণ্ঠনের পথ রুদ্ধ হলে, পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণীর বিলাসের প্রাসাদ ভেংগে পড়বে। সুতরাং কোনপ্রকার যুক্তি-তর্কের ধার না ঘেঁসে আইয়ুব খান ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ, ঢাকায় কনভেনশনপন্থী মুসলীম লীগের সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহযুদ্ধের হুমকী দিলেনঃ "প্রয়োজন হলে অস্ত্রের মুখে এর জবাব দেয়া হবে।"

ঐ একই দিনে পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "কোন হুমকীই জনসাধারণকে ৬-দফা দাবী আদায় আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।" পাঞ্জাবী শোষক-শ্রেণীর সুবুদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "দেশের উভয় অংশকেই শক্তিশালী করতে হবে। দেহের এক অংগ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে, সে দেহকে সবল দেহ বলা চলে না, সে-দেহ বিকলাংগ দেহ।

শক্তিশালী পাকিস্তানের জন্যে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার চাই।" বংগবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফার ব্যাখ্যা দিলেন :

"আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দালালগণ আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশ্‌মনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসীগণ সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীব নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃ-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণেব মুক্তি-সনদ ২১-দফা দাবী, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবী বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী...ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুক্‌রা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাহাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬-দফা

দাবী আজ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণেব জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকদের প্রতারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশ্‌মনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁহাদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার তাঁহাদের অফুরন্ত, মুখ দশটা, গলার সুর তাঁহাদের শতাধিক। ইহারা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে ইঁহারা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া আছেন অপোজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব-পকিস্তানের জনগণের দুশ্‌মনির বেলায় সকলে একজোট। তাঁহারা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য ইঁহারা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না, তাহাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁহারা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এই বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র প্রকাশ করা হইবে। আশাকরি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব-পাকিস্তানী মাত্রেই এই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা ঃ

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার

ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে-আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাঙলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়েছিলেন এই প্রস্তাবের দরুণই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব-বাঙলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৬-টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সবকাবী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁহাবা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবেব পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে,—এই সব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব-বাঙলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ ২১-দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়েই মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোনও নতুন দাবী তুলি নাই ; পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের পুরাতন দাবীরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোব-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁহারা আঁতকিয়া উঠেন, তাঁহারা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না

প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভাল—এই বিচারের ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া, আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২নং দফা ঃ

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখ্তিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার—এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাহাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুণই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা—এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এইটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই

অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখ্‌তিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তাহা নহে। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ত নহেই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, পোস্ট অফিসের ব্যাপারেও এই সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেট্‌স্' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে 'ফেডারেশন' অথবা 'ইউনিয়ন' বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র—সকলেই তাহাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট্' ও কেন্দ্রকে 'ইউনিয়ন'

বা 'ফেডারেশন' বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাঙলা 'প্রদেশ' নয়, 'স্টেট্'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট্' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব-পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন ?

৩ নং দফা :

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে-কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট্ ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে, যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ--

আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে, আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁহাদের খাতিরে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাহারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাহাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাহাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে, পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। ইহাতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাহাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাংগিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ড-প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাহাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থদপ্তর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দপ্তর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সেই অবস্থায় উভয়

অঞ্চলের একই নক্‌শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব-পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু করা হইবে এবং তাহাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু করা হইবে এবং তাহাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্‌শার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থ নৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখ্‌তিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব-পাকিস্তানের আয় পশ্চিম-পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশন সমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দুইএকখানি ব্যাংক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাংকের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ

পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুক্না বালুচব হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানেব প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকেব টিউবওযেলেব মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কাবণেই পূর্ব-পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পাবে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠিত হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচাবই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব-পাকিস্তানে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসেব দুর্মূল্যতা, জনগণেব বিশেষতঃ পাট-চাষীদেব দুর্দশা, সমস্তেব জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফাব ব্যাখ্যায় এ ব্যাপাবে আবও বিস্তারিত-ভাবে এ বিষযে আলোচনা করিয়াছি। এইখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ কবিতে না পাবিলে পূর্ব-পাকিস্তানীবা নিজেবা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসব হইতে পাবিবে না। কাবণ এই অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পাবে না।

৪নং দফা ঃ

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা, করধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারেব হাতে। ফেডাবেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে এই ভাবে জমানো টাকায়ই ফেডারেল সরকার তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কীরূপে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ত অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এইটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ ইহার একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয়, সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁহারা এইসব কথা বলিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে-ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এইটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা ইহাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁহারা এই খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দপ্তর ছাড়াও দুনিয়ায় অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তাহার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত

ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ-দপ্তর বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাহাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তাহার দেশরক্ষা-বাহিনী, পররাষ্ট্র-দপ্তর কি সেইজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ধার্য ট্যাক্স আদায়ের জন্য কোনও দপ্তর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাহাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার-বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগল্ ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগল্ ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশেনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখ্তিয়ারভুক্ত করা—এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা ঃ

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি ঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়েব পৃথক পৃথক হিসাব বাখিতে হইবে ;

(২) পূর্ব-পাকিস্তানেব অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব-পাকিস্তানের এখ্‌তিয়াবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানেব অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানেব এখ্‌তিয়াবে থাকিবে ;

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নিধাবিত হাবাহাবি মতে আদায় হইবে ;

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলেব মধ্যে আমদানী রপ্তানী চলিবে ;

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সবকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান কবিতে হইবে।

পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবাব জন্য এই ৩নং দফাব মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানেব আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসেব দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে ঃ

(ক) পূর্ব-পাকিস্তানেব অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেব শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব-পাকিস্তানের নাই—এই

অজুহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব-পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব-পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে, সেই পবিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব-পাকিস্তান যে পরিমাণ রপ্তানী করে, আমদানী করে সাধাবণতঃ তাহার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসাবেই পূর্ব-পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তাহার ফলে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসেব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এইটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সবকাবেব এখ্তিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রাব তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটেব ন্যায্য মূল্য ত দূরের কথা, আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলাব জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান সবকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন ; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়াব আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনরো-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তাহার দাম হয় পঞ্চাশ টাকা। এ খেলা গরীব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট-রপ্তানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোন প্রতিকার নাই,—এই কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কার্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে-শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নহে, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও 'এইড' আসিতেছে, তাহাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব-পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রপ্তানী সমান করিয়া, জনসাধাবণকে সস্তা দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া, তাহাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব-পাকিস্তানকে শিল্পায়িত কবিতে হইলে, আমাব প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬ নং দফা ঃ

এই দফায় আমি পূর্ব-পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনেব সুপাবিশ করিয়াছি। এই দাবী অন্যায়ও নয়, নূতনও নয়। ২১-দফার দাবীতে আমবা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধাবী সশস্ত্র-বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তাহা ত করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই-পি-আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীব হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ-অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী ২১-দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবীও পূরণ করেন নাই। পূর্ব-পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। ইহাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তানকে আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব-

পাকিস্তানকে বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব-পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে। এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতরো দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। করিতেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব-পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদের তাহাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমি পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চাই যে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এই ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা-বাহিনী গঠন করুন, অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন, নৌবাহিনীর দপ্তর এইখানে লইয়া আসুন। এই সব কাজ সরকার কবে করিবেন, আমি জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক-বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাহাও কেন্দ্রীয় রক্ষা-তহবিলে লইয়া যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এই অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে, গরিবীহালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবী কি অন্যায়? এই দাবী করিলেই কি তাহা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই-বোনেদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজি আছে :

এক, তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব-পাকিস্তানীদের অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবীও সমভাবেই রহিয়াছে। এই দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই, আমি যখন বলি, পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এই বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নহে। আমি ইহাও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে-অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে, সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব-পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা-বাহিনীর তিনটি দপ্তরই যদি পূর্ব-পাকিস্তানে হইত, তবে কাহার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত, একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা-বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায়। এই একুনে শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব-পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ বিজ্ঞানের কথা : সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাহাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব-পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব-পাকিস্তানে আমাদের

রাজধানী হইত, তবে এই সব খরচ পূর্ব-পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবী করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তোহ্‌মত (মিথ্যে অপবাদ) দিতেছেন, সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন, আপনারা ঐ সব দাবী করিলে আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গালি দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সেরূপ অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইত না। আপনাদের দাবী করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হক্‌টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্‌টাই চাই; আপনাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার তাওকাৎ (ক্ষমতা) থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে:

(১) প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বর-সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দপ্তর পূর্ব-পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ

লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬-টাতে পূর্ব-পাকিস্তানীব ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বব নির্বাচন কবিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা কবিলে ভোটেব জোবে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কবিতে পাবিতাম। তাহা না কবিয়া বাংলাব সঙ্গে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষাব দাবী কবিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা কবিলে ভোটেব জোবে পূর্ব-পাকিস্তানেব সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র বচনা কবিতে পাবিতাম।

(৫) আপনাদেব মন হইতে মেজবিটি ভয দূব কবিয়া সে-স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতা-বোধ সৃষ্টিব জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানেব আশ্বাসে আমবা সংখ্যা-গুরুত্ব ত্যাগ কবিযা সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ কবিয়াছিলাম।

চাব, সুতবাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনাবা দেখিতেছেন, যেখানে আমাদেব দান কবিবাব তাওকাৎ (ক্ষমতা) ছিল, সেখানে আমবা দান কবিযাছি। আব দান কবিবাব কিছুই নাই। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব-পাকিস্তানে বাজধানী হইত, তবে আপনাদেব দাবী কবিবাব আগেই আমবা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য-সত্যই দ্বিতীয় বাজধানী স্থাপন কবিতাম। দ্বিতীয বাজধানীব নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সবকাবেব সকল প্রকাব ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তাব নিখুঁত ব্যবস্থা কবিতাম। সকল ব্যাপাবে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমবা দেখাইতাম, পূর্ব-পাকিস্তানীবা মেজবিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব-পাকিস্তানীদেব নহে, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীব। পূর্ব-পাকিস্তানে বাজধানী হইলে তাহার সুযোগ লইয়া আমবা পূর্ব-পাকিস্তানীবা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস কবিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা

গভর্ণর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি. আই. ডি. সি., আপনাদেব ওয়াপদা, আপনাদেব ডি. আই. টি., আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট্, আপনাদেব বেলওয়ে ইত্যাদিব চেয়াবম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেবই কবিতে দিতাম। সমস্ত অল্-পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব-পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত কবিতাম না। ফলতঃ পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু কবিতাম না। দুই অঞ্চলেব মধ্যে এই মাবাত্মক ডিস্প্যাবিটি (বৈষম্য) সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমন উদাবতা, এমন নিবপেক্ষতা, পাকিস্তানেব দুই অঞ্চলের মধ্যে ইন্সাফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমেব বুনিয়াদ। এটা যাব মধ্যে আছে, কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতাব মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানেব উভয় অঞ্চলেব উপর নেতৃত্ব দিবাব যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস কবেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান বাষ্ট্রেব বাষ্ট্রীয় দেহেব দুইচোখ, দুই নাসিকা, দুই কান, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা , যে নেতা বিশ্বাস কবেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী কবিতে হইলে এই সব জোড়াব দুটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী কবিতে হইবে ; যে নেতা বিশ্বাস কবেন পাকিস্তানেব এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে ; যে নেতা বিশ্বাস কবেন ইচ্ছা কবিয়া বা জানিযা শুনিয়া যাবা পাকিস্তানেব এক অঙ্গকে দুর্বল কবিতে চাহে, তাহাবা পাকিস্তানেব দুশ্মন ; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশ্মনদেব শায়েস্তা কবিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানেব জাতীয় নেতা হইবাব অধিকারী। কেবল তাঁহার নেতৃত্বে পাকিস্তানেব ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানেব মত বিশাল ও অসাধারণ বাষ্ট্রেব নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবা এই মাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তাহা যদি তাঁহারা করেন, তবে দেখিবেন

পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের বাঁচার দাবী নহে, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবী।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবীতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম-পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমাব সুপারিশ গ্রহণ কবিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম (মিথ্যে দোষারোপ) লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নহে, বিস্ময়েব কথাও নহে। পূর্ব-পাকিস্তানেব মজলুম জনগণেব পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই ইহাদের কাছে গালি খাইয়াছেন, ইহাদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ কবিয়াছেন, আব আমি ত কোন ছার! দেশবাসীর মনে আছে, আমাদেব নয়নমণি শেবে বাংলা ফজলুল হক্‌কে ইঁহারা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী ইহাও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানেব সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল ইঁহাদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বি-দের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্‌ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে সাত কোটি পূর্ব-পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এই কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ কবিয়াছি। তাঁহাব পায়েব তলে বসিয়াই এতকাল দেশ-বাসীর খেদমত কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনেব কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমাব দেশেব প্রিয় ভাই-বোনেবা, আল্লাহ্‌র দবগায় শুধু এই দোওয়া কবিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত কবিতে পারি।

আপনাদেব স্নেহ-ধন্য খাদেম

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২ স্বাঃ – শেখ মুজিবুব বহমান

গৃহযুদ্ধেব হুমকি সত্ত্বেও পূর্ব-বাংলাব স্বায়ত্তশাসনেব দাবী বাংলাব ঘবে ঘবে তাব প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেলো। ১৯৬৬ সালেব ২১শে এপ্রিল তাবিখে শেখ মুজিবকে ঢাকায় গ্রেপ্তাব কবা হলো। অধিনায়ককে জনতাব কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাব জন্যে জনতাব ভ্রূক্ষেপ নেই। অধিনায়কেব নির্দেশিত পথে এগিয়ে চললো বাংলাব বীব জনতা।

১৯৬৬ সালেব জুন মাসেব ৪ঠা তাবিখ থেকে ৬ই জুন পর্যন্ত ঢাকায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটিব অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সে অধিবেশনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিব বিখ্যাত চৌদ্দ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়। চৌদ্দ দফাব অষ্টম দফায় দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা-সংক্রান্ত দায়িত্ব ব্যতিবেকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে—এই মর্মে দাবী কবা হলো। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিব কেন্দ্রীয় কার্যকবী কমিটির সভায় স্বায়ত্তশাসনের দাবী আনা হলো বটে, কিন্তু তাহলো চৌদ্দ দফার অন্যতম দফা—স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে মুখ্য এবং প্রধানতম করা হলো না, কিংবা স্বায়ত্তশাসনের এই দাবীর কোন স্পষ্ট রূপরেখা দেয়া গেল না, অথবা দিতে পারা গেল না। এর কারণ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে মাহমুদ আলী কাসুরী, সি. আর. আসলাম, মিঞা

সওকত, মিঞা মাহ্‌মুদ এবং অন্যান্য পশ্চিম-পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের প্রবল বিবোধিতা। মাহ্‌মুদ আলী কাসুবী তাঁব বক্তব্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিব সংগ্রামকে শেখ মুজিবেব বিরুদ্ধে নিয়োজিত কবা হোক, এমন মনোভাব প্রকাশ কবেন। মহীউদ্দীনেব নেতৃত্বে জুন আন্দোলনকে সমর্থন কবাব একটা বক্তব্য উপস্থিত কবা হলো, তা পশ্চিম পাকিস্তানীদেব প্রবল বিবোধিতায নাকচ হয়ে যায়। স্বায়ত্তশাসনেব বিবোধী এবং শেখ মুজিবেব ৬-দফা আন্দোলন-বিবোধী পশ্চিম-পাকিস্তানী এই সমস্ত ভদ্রলোকেবা, মুখে সমাজতন্ত্রেব কথা আউড়িযে, প্রকৃতপক্ষে, বাংলাব স্বাধিকাবেব দাবীব বিবোধিতা কবেছে, এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক-গোষ্ঠীব বিশ্বস্ত অনুচবেব দাযিত্ব পালন কবেছে। মাহ্‌মুদ আলী কাসুবী, সমাজতন্ত্রেব সেই উজ্জ্বল প্রবক্তা (যাব বাৎসবিক আয় লক্ষ টাকাব ওপবে), বর্তমানে তাব দলবল সহ ভুট্টোব পার্টিতে তাব সেবায় নিযোজিত, পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি, সে মুখে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শোষণেব বিরুদ্ধে মুখে সে যতই বিষোদগাব করুক না কেন, বাংলাব পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনেব প্রশ্নে শাসকশ্রেণীব সংগে তাদেব মত ছিলো এক এবং অভিন্ন। পার্থক্য শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীব ক্ষমতায় থেকে নির্লজ্জভাবে পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি-গোষ্ঠী লুণ্ঠনেব শিকাব বানিযেছে, আব ন্যাপেব প্রগতিশীল (?) পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যেবা সমাজতন্ত্রেব দাবীব আববণে ন্যাপকে বাংলাব স্বাধিকাব আদায়েব আন্দোলনে কার্যকবী ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিবত বেখেছে। এদেব ভূমিকা ছিলো সুপবিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকা,—প্রগতিশীলতাব নামে বাংলার মানুষেব স্বার্থেব পবিপন্থী ভূমিকা। এবং এজন্যেই আজও মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি ওয়ালী খান বাংলাব স্বাধিকাবেব সংগ্রাম, বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমর্থন করতে পাবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠান বা নেতা বাংলা

দেশে ব্যাপক গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আজও কোন আন্দোলনের ডাক দেয়নি। আর এই উপলব্ধি থেকেই এই সেদিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর সংগঠনকে শুধুমাত্র বাংলা দেশের সংগঠন বলে ঘোষণা করেছেন, এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পশ্চিম পাকিস্তানী অংশকে তাঁর সংগঠন থেকে ছাটাই করে দিয়েছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সংগ্রামী জননেতার উপলব্ধি হয়েছে,—নির্মম সত্যের চরম উপলব্ধি : "পশ্চিম পাকিস্তান হলো পশ্চিম পাকিস্তান, আর বাংলা দেশ হলো বাংলা দেশ,—দুই দেশ, দুই সংস্কৃতি, দুই মন, দুই জাতি।"

৯ই মে শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হলেন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে। শাসকশ্রেণী তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতের দালাল ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করলো। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীকে যে কারণে বলা হয়েছিলো বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারতের দালাল, ১৯৬৬ সালে সেই একই কারণে শেখ মুজিব হলেন বিচ্ছিন্নতা-বাদী, ভারতের দালাল। শুধু তা-ই নয়। প্রকারান্তরে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের দেশদ্রোহী রূপে চিহ্নিত করা হলো। তাজউদ্দীন আমেদ, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, আব্দুল মোমেন সহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে নির্বিচারে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হলো। কিন্তু সমস্ত প্রকার দমন-নীতিকে উপেক্ষা করে ৭ই জুন সমগ্র বাংলা দেশব্যাপী হরতালের প্রস্তুতি চলতে লাগলো। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেলো ঢাকা ও মফস্বল শহরের প্রতিটি দেয়াল। অসংখ্য প্রচারপত্র বিলি হোলো বাংলার হাটে বাজারে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে।

তারপর, ৭ই জুন। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়লো সারা বাংলা দেশ। শ্রমিক এলাকা থেকে শ্রমিকরা এগিয়ে এলো ঢাকা শহরের দিকে। ঢাকা শহরের জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেলো। নিরস্ত্র

মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সশস্ত্র পুলিশ। লাঠি, গুলি, কাঁদুনে গ্যাস। রক্তে রক্তে ভেসে গেল ঢাকা-চট্টগ্রামের রাজপথ। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ কবা হলো। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার অফিস তালাবদ্ধ করা হলো।

আপাতঃদৃষ্টিতে, ৭ই জুনের প্রকাশ্য আন্দোলনকে প্রচণ্ড দমননীতির ষ্টীম রোলার চাপিয়ে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলো আইয়ুব সরকার। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষেব মন থেকে তাব প্রাণের স্বাধিকারের দাবীকে নিশ্চিহ্ন করতে পাবেনি। ১৯৬৭ সালে এবং ১৯৬৮ সালেও বাংলা দেশের বঞ্চিত-বিক্ষুব্ধ মানুষ ঐতিহাসিক ৭ই জুন দিবস পালন কবেন পবিপূর্ণ মর্যাদাব সংগে। ১৯৬৭ সালে প্রাদেশিক বিধান সভায়, বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যেরা বাজেট অধিবেশন বর্জন কবে পবিষদ কক্ষ ত্যাগ কবেন।

১৯৬৭ সালেব মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশেব মাটিতে একটা চাপা বিক্ষোভ; যে-কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোবণ ঘটতে পাবে। শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশেব মানুষেব পুঞ্জীভূত ক্রোধ ফেটে পড়তে চাইছে। শেখ মুজিব তখন পাকিস্তান প্রতিবক্ষা আইন বলে কাবা-প্রাচীরের অন্তরালে। পিণ্ডির সামবিক চক্র দুর্যোগময় অনাগত ভবিষ্যতেব প্রমাদ গুনছে। আবার ষড়যন্ত্রেব জাল বিছানো হলো। তৈবী হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়াবী, পাকিস্তান সরকারের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বের হলো। বিজ্ঞপ্তিব মর্মকথা : ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনের প্রথম সচিব শ্রী পি. এন. ওঝার সংগে পাকিস্তান-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার জন্যে একদল রাজনীতিবিদ্‌, সরকারী ও সামরিক কর্মচারীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৮ই জানুয়ারী পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করলো : শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। সুতরাং সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে। বিচারের জন্যে স্পেশ্যাল

ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলো। ১৯শে জুন থেকে ঢাকা ক্যাণ্টন-মেণ্টে শুরু হয এই বিচাবেব প্রহসন।

আগবতলা ষডযন্ত্র মামলা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং তাব পদলেহী উচ্ছিষ্টভোগী দালালদেব এক ঘৃণ্য ষডযন্ত্রেব নজীব। এবা শেখ মুজিবকে ভাবতেব সংগে ষডযন্ত্রে লিপ্ত ঘোষণা কবে একদিকে যেমন বাংলাব স্বাধিকাবেব এই প্রভাতী সূর্যকে হত্যা কবতে চেযেছিলো, অন্যদিকে তেমনি বাংলাব স্বায়ত্তশাসনেব দাবীকে জাতিস্বার্থেব বিবোধী এবং বিদেশী বাষ্ট্রেব চক্রান্তসৃষ্ট বলে জনসমক্ষে তুলে ধববাব অপপ্রযাস কবেছিলো।

শেখ মুজিব লিখিত জবানবন্দী দিলেন আদালতে। জবান-বন্দী নয—একটি ইতিহাস, বাংলাব মানুষেব কঠিন সংগ্রামেব ইতিহাস, কী কবে বাংলাব স্বাধীনতাযুদ্ধেব এই মহানাযককে পদে পদে নির্যাতিত কবা হযেছে, তাব ইতিহাস। এই লিখিত জবানবন্দীতে, ক্যাণ্টনমেণ্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালেব প্রহসনেব কাব-খানায দাঁডিযে মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও বাংলাব মহানাযক এই প্রহসনেব হোতা শাসকচক্রকে পাল্টা অভিযোগে অভিযুক্ত কবলেন, অভিযুক্ত কবলেন, বাংলাব মুক্তিকামী মানুষেব দববাবে, অভিযুক্ত কবলেন, বিশ্বমানবতাব দববাবে :

"* * * * * ১৯৬৬ সালেব গোডাব দিকে লাহোবে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয জাতীয সম্মিলনীব বিষয নির্বাচনী কমিটিব নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেব সমস্যাবলীব নিয়ম-তান্ত্রিক সমাধানেব উদ্দেশ্যে আমার পার্টিব পক্ষ হইতে একটি সুনির্দিষ্ট ৬-দফা কর্মসূচীউত্থাপন কবি। এই ৬-দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেব, উভয অংশেব জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী কবা হইয়াছে।

অতঃপর, আমার প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশেব উভয় অংশের মধ্যকাব অর্থ-

নৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ৬-দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রসংগ্রহ, গৃহযুদ্ধের চেষ্টা চালানো ইত্যাদি অভিযোগে আধ-ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানী কবিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি খুলনায় একটি জনসভা করিয়া, যশোব হইয়া, ঢাকায় ফিরিতেছিলাম। তখন তাহারা যশোরে আমার পথ রোধ কবে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে এইবারের মত প্রথম গ্রেপ্তার কবে।

আমাকে যশোর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে, তিনি আমার অন্তবর্তীকালীন জামীন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদব দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকেব সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে জামীনদানে অসম্মত হন। কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামীন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা ৭টায় নিজগৃহে গমন কবি। সেই সন্ধ্যায়ই ৮টায় পুলিশ পুনবায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতাব উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে আমার বাসভবন হইতে আমাকে গ্রেপ্তার করে এবং সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আমার জামীনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পর-দিবস সিলেটের মাননীয় দায়বা জজ আমার জামীন প্রদান করেন, কিন্তু আমি মুক্ত হইবার পরই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায় গ্রেপ্তার করে। এবারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ময়মনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেইরাত্রে আমাকে পুলিশ

পাহারাধীনে ময়মনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একই ভাবে ময়মনশাহীব মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমাব জামীন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পবে মাননীয় দায়বা জজ প্রদত্ত জামীনে মুক্তি লাভ কবিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন কবি। উপবিউক্ত সকল ধাবাবাহিক গ্রেপ্তাবী প্রহসন ও হযরানী ১৯৬৬ সালেব এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালেব মে মাসেব প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবতঃ ৮ই মে, নাবাযণ-গঞ্জে এক জনসভায বক্তৃতা প্রদান কবি এবং বাত্রে ঢাকায নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন কবি। বাত ১-টাব সময পুলিশ "ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল্‌স্‌'-এব ৩২ ধাবায আমাকে গ্রেপ্তাব কবে। একই সংগে আমাব প্রতিষ্ঠানেব বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তাব কবা হয়। ইহাদেব মধ্যে ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান আওযামী লীগেব সহ-সভাপতি খোন্দকাব মুস্তাক আহমদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, জনাব মুজিবুব বহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওযামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, আওযামী লীগেব কোষাধ্যক্ষ, জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুবী, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগেব শ্রম-সম্পাদক, জনাব জহুব আহমদ চৌধুবী সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ইহাব অল্প কয়েকদিন পবে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগেব সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব মীজানুর বহমান চৌধুবী এম-এল-এ, প্রচাব সম্পাদক, জনাব মোমেন—এ্যাডভোকেট, সমাজ-কল্যাণ সম্পাদক ওবায়দুব বহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি, জনাব হাফিজ্‌ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পবিষদ সদস্য, মোল্লা জালালউদ্দীন আহমেদ এ্যাডভোকেট, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুব আলী, প্রাক্তন এম-এল-এ জনাব আমজাদ হোসেন, এ্যাডভোকেট জনাব আমীনুদ্দীন আহমদ, পাবনার এ্যাডভোকেট, জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক, জনাব মহীউদ্দীনে

আহমদ, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক, জনাব মোহাম্মদউল্লাহ্, এ্যাডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক সিরাজউদ্দীন আহমদ, রাজাববাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক, জনাব হারুনুব রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি, শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদব উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক, জনাব আব্দুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি, জনাব রশীদ মোশার্‌বফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক, জনাব সুলতান আহমদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব মুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক, জনাব আব্দুল মান্নান, পাবনাব এ্যাডভোকেট জনাব হাসনাইন এবং আরো অসংখ্য আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনেব ৩২ ধারা বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ কবা হয়। আমাব দুই ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র-লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়েব ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কাবাকদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাক'কেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক, জনাব তোফাজ্জল হোসেন. ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া. তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম পোর্ট-ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জবাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা-বিধি বলে অন্ধকারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালে ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলীতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে এগারো জন নিহত হয়। পুলিশ প্রায় আট শ' লোককে গ্রেপ্তার করে ও অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব-পাকিস্তানের গবর্নর জনাব মোনায়েম খান প্রায়শঃই তাঁহার লোকজন ও সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, তিনি যতদিন গদীতে আসীন থাকিবেন, ততদিন শেখ মুজিবুরকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবাব বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় এগারো মাস আটক বাখার পব একদিন রাত ১টার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগাবের ফটক হইতে কতিপয সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধকক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না। বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ ৫ মাস কাল আটক থাকিতে হয়। এই সময়ে আমাকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয়, ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন আমি প্রথম এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌঁসুলী নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার

দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনেব দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সততার ন্যায়সংগত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্নসৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবাব পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এক্স-কর্পোবাল আমীর হোসেন, সুলতানউদ্দীন আহমেদ, কামালউদ্দীন আহমেদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেণ্ট মাহ্ফুজ উল্লাহ্ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মচাবীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুলকুদ্দুস ও জনাব খান মোহম্মদ শামসুর রহমান--এই তিনজন সি. এস. পি. অফিসারদের আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকাবী কার্য সম্পাদনকালে তাহাদিগকে জানিবাব সুযোগ পাইয়াছিলাম; এবং তাহারাও তখন পূর্ব-পাকিস্তান সবকাবের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাহাদের সংগে কখনো রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লেঃ কেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে, অথবা করাচীতে জনাব কামালুদ্দীনের বাসগৃহে গমন করি নাই, কিংবা আমার অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনেব, অথবা করাচীতে জনাব কামালুদ্দীনের বাসগৃহে কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত কোন আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় সংগঠিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত কাহাকেও টাকা দেই নাই। আমি কখনও ডঃ সাইদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত

ষড়যন্ত্রের সাহায্য করিতে বলি নাই। তাহারা চট্টগ্রামের আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানের ৩ জন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং ৮ জন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম. এল এ ও এম. পি. বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদের ৫ জন ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০ জন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ, প্রাক্তন এম. এল. এ, এম. পি. এ, অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী, একজন সাধারণ এল. এম. এফ. ডাক্তার সাইদুর রহমানকে কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগপ্রার্থী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডাঃ সাইদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডাঃ সাইদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল; দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম—৬-দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মংগলকর ভাবিয়াছি, আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডীর ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠীর এবং স্বার্থবাদীদের হাতে

নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশতঃ এই মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ১৮ ব্যক্তির কথা লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে, তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে এ কথা জানাতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগত ভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হইতে কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলাও উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন-নীতির প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসক-গোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে, এই মামলা তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া।..."

সেদিন আদালতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে যে বজ্রকণ্ঠ বাংলাকে শোষণ করার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রকে বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরেছিলো, সে কণ্ঠকে স্তব্ধ করার ক্ষমতা স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর ছিলো না। যে নির্ভীকচিত্ত সেদিন মৃত্যুর

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীব্র ঘৃণায় সাধুর মুখোস-পরা লুণ্ঠনকারী দস্যুদের মুখোসকে উন্মোচিত করেছিলেন, তাকে শাস্তি দেয়ার সাহস ষড়যন্ত্রকারীদের ছিলো না। কারণ তখন টেকনাফ থেকে খাইবার পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ১৪৪ ধারা, কারফিউ, গুলি ইত্যাদি দমননীতির সমস্ত পর্যায়কে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পায়ের নীচে মাড়িয়ে এসেছে : এশিয়ার লৌহমানব (!) দাম্ভিক আইয়ুবের মাথাকে টেনে ধূলোয় নামিয়ে দিয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। মামলা প্রত্যাহৃত হলো, জনতার রায় চূড়ান্ত রায়। জনতার রায় — শেখ মুজিব বিদ্রোহী বাংলার বীর সন্তান।

১৯৬৮ সাল ছিলো প্রস্তুতির যুগ। একদিকে শাসকশ্রেণী প্রস্তুতি নিচ্ছিলো বাংলা তথা পাকিস্তানের মুক্তি-সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে। অন্যদিকে বাংলার মানুষ তথা পাকিস্তানের সমগ্র জনতা সামরিক শাসনের কঠিন লৌহশৃঙ্খলকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো। সমস্ত দেশে একটা চাপা গুঞ্জন, চাপা আক্রোশ। থমথম করছে সারাটা দেশ : অপেক্ষা করছে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ; আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎগিরণের। এমনি সময়ে বৃদ্ধ জননেতা মওলানা ভাসানী ৬ই ডিসেম্বর তারিখে সারা দেশব্যাপী দমননীতি বিরোধী দিবস ঘোষণা করলেন।

দমননীতি বিরোধী দিবস।

ঢাকার পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর বিরাট জনসভা। জনসভা শেষে মওলানা ভাসানী লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল নিয়ে গভর্নর হাউস ঘেরাও করলেন। শুরু হলো মওলানার ঘেরাও আন্দোলন। পুলিশের ব্যারিকেড ভেংগে এগিয়ে চললেন মওলানা ভাসানী। পেছনে তাঁর লক্ষ লক্ষ জনতা। ক্রুদ্ধ পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে গবর্নর হাউসের পাষাণ অট্টালিকা। লাঠি চার্জ হলো। পুলিশের আক্রমণ উপেক্ষা করে মিছিল শহর প্রদক্ষিণ

করলো। মিছিল শেষে মওলানা ভাসানী বায়তুল মোকাররম মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন : ৭ই ডিসেম্বর হরতাল। যানবাহন, কল-কারখানা, চাকা বন্ধ। ১৪৪ ধারা জারি হলো। ১৪৪ ধারা অমান্য করে অগণিত বিক্ষুব্ধ জনতা সহ এগিয়ে চললেন মওলানা ভাসানী। রায়ট কার এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। দমকল দিয়ে মওলানা ভাসানী সহ মিছিলের ওপরে তপ্ত জল ছিটিয়ে দেয়া হলো। মিছিল তবু এগিয়ে যায়। জিন্নাহ্ এভিনিউতে লাঠি চার্জ হলো। কিন্তু কার সাধ্য জনতার এ উত্তাল তরংগকে রোধ করে! সমগ্র ঢাকা নগরী এক রণক্ষেত্র। বাংলার তরুণ আর কৃষক শ্রমিকের বুকের রক্তে ভেজা বাংলার মাটি। শুধু ঢাকা নয়, সারা বাংলা দেশে সেদিন বুকের রক্ত ঢেলে বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্রজনতা আইয়ুব সরকারের শাসনযন্ত্রের চাকা বন্ধ করে দিয়েছিলো। তীব্র রোষে প্রচণ্ড ঘৃণায় ফেটে পড়েছিলো বাংলা দেশের মানুষ। নিপীড়িত মানুষের মহা অভ্যুত্থান। তিন মাস পূর্বে 'উন্নতির দশক' পালন করে আইয়ুব তাঁর সামরিক এক-নায়কত্বের ঢাক পিটিয়েছিলেন অনুগ্রহভাজনদের দিয়ে। আর মাত্র তিন মাস পরে দশ বছরের আইয়ুবী মহিমাকে সমাধিস্থ করার জন্যে বাংলাদেশে সংগঠিত হলো এক ঐতিহাসিক মহা অভ্যুত্থান।

সংগ্রামী মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আইয়ুব নির্বাচনী টোপ ফেল্‌লো। ১৯৬৯ সালে ২রা জানুয়ারীতে বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানার মহীপুরে পূর্ব-পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যকরী কমিটির অধিবেশন বসলো। কমিটির সভায় মওলানা ভাসানী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "দেশে পূর্ণ-গণতন্ত্র ফিরে না-আসা পর্যন্ত আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে পারে না, সামরিক শাসক রাইফেল উঁচিয়ে, সংগীনের খোঁচায় নির্বাচন করবে তা আমরা হতে দেবো না। এই

নির্বাচন আমি বয়কট করলাম। আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এই নির্বাচনের প্রহসন আমি কিছুতেই হতে দেবো না। এই নির্বাচনকে আমরা রুখবো। আইয়ুবের সমস্ত চক্রান্তকে আমরা বানচাল করে দেবো।”

বৃদ্ধ নেতার সেই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাকে সেদিন কেউ কেউ বাতুলের প্রলাপ বলে উপহাস করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেলো মাত্র কয়েকদিন পরে অর্থাৎ ৭ই এবং ৮ই জানুয়ারী তারিখে ঢাকা শহরে পাকিস্তানের আইয়ুব বিরোধীরা ডেমোক্রেটিক এ্যাক্শন্ কমিটি গঠন করে, ৮-দফা দাবী পেশ ক'রে নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু ডেমোক্রেটিক এ্যাক্শন্ কমিটিতে ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর অপর অংশ—মমতাজ দৌলতানা, নবাবজাদা নছরুল্লাহ খান, জামাতে ইসলামের মওলানা মওতুদী, চৌধুরী মোহম্মদ আলী প্রভৃতি। সুতরাং বাংলার স্বাধিকারের দাবী ৮-দফার কর্মসূচীতে গৃহীত হতে পারলো না। দক্ষিণপন্থী Democratic Action Committee (D. A C.)-এর কর্মসূচীতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বিদ্রোহী বাংলার অতন্দ্র সেনা ছাত্রসমাজ। জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে শোষণের কেন্দ্রবিন্দু কোথায়? সুতরাং বাংলা দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি চাই—চাই বাংলা দেশের রাজনৈতিক মুক্তি।

সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম-পরিষদ আগেই গঠিত হয়েছিলো। 'DAC'-এর ৮-দফা কর্মসূচীর কয়েকদিন পূর্বেই তাঁরা ১১-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯৬৯ সালের ৬ই জানুয়ারী ১১-দফা কর্মসূচী প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ৫ই জানুয়ারী ১১-দফা কর্মসূচী নিয়ে তাঁরা দেখা করেছিলেন 'D A C'-এর নেতৃবৃন্দের সংগে, চেয়েছিলেন তাঁদের সমর্থন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণীর স্বার্থের তল্পীবাহক দৌলতানা, নছরুল্লাহ খান, মওতুদী, চৌধুরী মোহম্মদ আলী, মাহমুদল হক ওসমানী

তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শূন্য হাতে। ১১-দফা তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী। ১১-দফার ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই তাড়াহুড়ো করে বাংলা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দলিল ৮-দফা কর্মসূচী তারা প্রণয়ন করেছিলেন। ভীত হয়ে পড়েছিলো পাঞ্জাবী শোষকশ্রেণী এবং তাদের তাঁবেদাররা। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধিকারের আন্দোলন, তাঁদের শোষণের দুর্গকে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে। সুতরাং ৮-দফার কর্মসূচীতে বাংলার স্বাধিকারের প্রশ্ন ঠাঁই পেলো না। কিন্তু বিদ্রোহী বাংলার বিপ্লবী ছাত্রসমাজ ষড়যন্ত্রের মুখোস উন্মোচন করে দিয়ে, ১১-দফা কর্মসূচীকেই সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে বাংগালী জাতির সম্মুখে তুলে ধরলেন।

১১-দফার প্রথম দফায় ছিলো : শিক্ষাসমস্যার আশু সমাধানের দাবী ;

দ্বিতীয় দফায় ছিলো : প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী ;

তৃতীয় দফায় ছিলো : বাংলাদেশের প্রাণের দাবী, স্বায়ত্তশাসনের দাবী।

সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম-পরিষদ স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা দিলেন। তাঁরা বললেন, "দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক এবং আইন পরিষদের থাকবে সার্বভৌম ক্ষমতা। বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা এবং মুদ্রা—এই তিনটি বিষয়ে ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য বিষয়ে, অংগরাজ্যের নিরংকুশ ক্ষমতা থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্যে একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকবে যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে ; দুই অঞ্চলে দু'টি পৃথক

রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যে পৃথক অর্থ-নীতি প্রবর্তন করতে হবে। সকল কর বা খাজনা ধার্য করা এবং তা আদায় করার ক্ষমতা থাকবে অংগরাজ্যের হাতে। ফেডারেল সরকার কোন কর ধার্য করতে পারবে না। অংগরাজ্যের আদায়ী রেভেনিউর নির্বাচিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে এবং এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান থাকবে শাসনতন্ত্রে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক্ পৃথক্ হিসেব রাখবে এবং বহির্বাণিজ্যে অর্জিত মুদ্রা অংগরাজ্যের এখ্তিয়ারে থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অংগ রাজ্যগুলি শাসনতন্ত্রের নিধারিত হারে ফেডারেল সরকারকে দেবে। দেশজাত দ্রব্য বিনাশুল্কে অংগ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আদান-প্রদান চলবে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড্ মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রপ্তানী করার অধিকার অংগ রাজ্যের থাকবে। পূর্ব-পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী-বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীব সদর দপ্তর স্থাপন করতে হবে।”

চতুর্থ দফায়, পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে ফেডারেশনের দাবী করা হলো।

পঞ্চম দফায়, ব্যাংক, বীমা, ইনসিওরেন্স, পাট ব্যবস্থা সহ সকল বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের দাবী করা হলো।

ষষ্ঠ দফায়, কৃষকদের ওপর কর ও খাজনা হ্রাস, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য চল্লিশ টাকা ও আখের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের দাবী করা হলো।

সপ্তম দফায়, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দাবী করা হলো। শ্রমিকস্বার্থ-

বিরোধী কালা কানুন প্রত্যাহার ও শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারের দাবী করা হলো।

অষ্টম দফায়, পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জল-সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের দাবী করা হলো।

নবম দফায়, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহারে দাবী করা হলো।

দশম দফায়, সিয়াটো, সেণ্টো ইত্যাদি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট-বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের দাবী করা হলো।

এগারো এবং শেষ দফায়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহারের দাবী করা হলো।

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণীর এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিশ্বস্ত পাহারাদার মওদুদী, দৌলতানা, খাজা নছরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহম্মদ আলী, ফরিদ আহমদের দল এগারো দফার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, দশম, একাদশ দফা দাবী কিছুতেই সমর্থন করতে পারেনি, কারণ এই দফাগুলো ছিলো তাঁদের এবং তাঁদের প্রভুদের স্বার্থের পরিপন্থী। এমন কি, ওয়ালী খানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ১১-দফা দাবীকে মেনে নিতে পারেননি। তার প্রমাণ, ওয়ালী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদল হক ওসমানী করাচীতে ১৯৬৯ সালের ১২ই মার্চে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন, ১১-দফার পঞ্চম দফা অর্থাৎ ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স, পাট ব্যবসা সহ সকল বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের দাবী অবাস্তব, সেজন্যে তার দল এই দাবী সমর্থন করে না। ওয়ালী খানের ন্যাপ যে ১১-দফা দাবীপূর্ণ সমর্থন করতে পারেনি, তার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো

—এই সেদিন মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠককালেও ওয়ালী খান শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবীকে সমর্থন করেননি এবং বৈঠক শেষে করাচীতে গিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শেখ মুজিবের বক্তব্যকে বিচ্ছিন্নতাবাদীর বক্তব্য —এই মর্মে ইংগিত করেছেন এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন—এই মর্মে ঘোষণা করে সামরিক সরকারের প্রিয়ভাজন হবার প্রয়াস পেয়েছেন।

১১-দফা আন্দোলন ছিলো বাংগালীর জাতীয় আন্দোলন। এবং এ-আন্দোলনের নায়ক ছিলেন তোফায়েল আহমদ, মোস্তাফা জামাল হায়দার, মাহবুব উল্লাহ্, সায়ফুদ্দীন মাণিক, সামছুদ্দোহা, আব্দুর রউফ প্রভৃতি। সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম-পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত ১১-দফা ছিলো বাংগালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় প্রকাশ। DAC-এর ৮-দফা ছিলো আইয়ুব সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আপোষে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার জন্যে। সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম-পরিষদেব এগারো দফা ছিলো সংগ্রামের জন্যে,—বাংলার মানুষের মুক্তির জন্যে। সুতরাং আপোষকামীরা পেছনে পড়ে রইলেন; এগিয়ে চললো বিদ্রোহী ছাত্রদের নেতৃত্বে বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামী মানুষ।

১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারী।

সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম-পরিষদের আহ্বানে হরতাল। ১৪৪ ধারা জারী করলো আইয়ুব সরকার। ছাত্রেরা আইন অমান্য করলো। শুরু হলো পুলিশে-ছাত্রে সংঘর্ষ। ১৮ই এবং ১৯শে জানুয়ারী একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ২০শে জানুয়ারী সশস্ত্র বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে ফেললো। ছাত্রদের বেরুতে দেবে না কিছুতেই। শুরু হলো লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার। চরম উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণ। —"আজ পিছিয়ে গেলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। ভেংগে চুরমার করে দিতে হবে প্রতিক্রিয়ার লৌহকঠিন দুর্গ।" আসাদ। বাংলা দেশে একটি সংগ্রামী নাম।

আইনের ছাত্র। কৃষক আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। জরতপ্ত দেহ। কাঁপছে। কাঁপছে থর থর করে প্রচণ্ড ক্রোধে। চোখে জ্বলছে আগুন। ঝাঁপিয়ে পড়লো সম্মুখে: "মানি না, ১৪৪ ধারা মানি না।"

মাত্র দশ হাত দূর থেকে একটা গুলী ছুটে এসে বিদ্ধ করলো তাকে। ঢলে পড়লো আসাদের প্রাণহীন দেহ। থোকা থোকা রক্তে ভিজে গেলো বাংলার নরম মাটি। সোনার বাংলার মাটির বুকে শেষ হাসিটি বিলিয়ে দিয়ে মায়ের কোলে চিরদিনের জন্যে যেন মুখ গুঁজে রইলো আসাদ। বাংলা দেশের সংগ্রামের এক মূর্ত প্রতীক।

বন্যার জোয়ারে যেন বাঁধ ভেংগে গেলো। সশস্ত্র-বাহিনী আর ছাত্রদের মধ্যে হাতাহাতি প্রচণ্ড সংঘর্ষ। মৃত্যুকে ভয় নেই; মুক্তি চাই। রক্তটুকু ঢালতে চাই; মুক্তি চাই।

আসাদের মৃত্যুর খবর পৌঁছে গেলো বাংলার প্রান্তদেশে। প্রাণ দেয়ার নেশায় উন্মাদ হয়ে গেলো সারা বাংলার মানুষ। ২১শে, ২২শে, ২৩শে জানুয়ারী এবং তার পরও হরতাল, শুধু হরতাল, চাকা বন্ধ্। 'এগারো দফা মানতে হবে,' 'ক্যান্টনমেণ্ট পুড়িয়ে দাও,' 'শেখ মুজিবকে ছাড়িয়ে নাও,' 'জেলের তালা ভাংগতে হবে, রাজবন্দীদের আনতে হবে,' 'শোষণের দুর্গ ভাংগতে হবে, স্বাধিকার আনতে হবে,' 'আইয়ুব সরকার নিপাত যাক', 'মুক্তির একই নাম—সংগ্রাম, সংগ্রাম'। যুবক, কিশোর, তরুণের রক্তে ভেজা মাটি থেকে সংগ্রামের যে গর্জন ধ্বনি বের হলো, তাতে টলটলায়মান হয়ে গেলো আইয়ুবের তখ্‌ত-তাউস্—সুখের সিংহাসন। সেদিন ঢাকার বুকে বিদ্রোহের যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো, তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো বাংলার মাঠে মাঠে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি জনপদে। কোটি কণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জনে দিশেহারা, কয়েকদিন আগেকার স্ব-ঘোষিত এশিয়ার 'লৌহমানব' আইয়ুব খান। ২৮শে এবং ২৯শে জানুয়ারীতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা

আইনে গ্রেপ্তার করা হলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কয়েক সহস্র রাজনৈতিক কর্মীকে। কিন্তু মুক্তির সেই মহান সংগ্রামকে দমন-নীতির স্টিম রোলার চালিয়ে হত্যা করবার ক্ষমতা ছিলো না আইয়ুব সরকারের।

সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম-পরিষদ ৯ই ফেব্রুয়ারী 'শপথ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করলো। ৯ই ফেব্রুয়ারীতে বাংলার সংগ্রামী জনতা শপথ নিলো,—জীবনের বিনিময়ে তারা প্রতিষ্ঠা করবে ১১-দফা দাবীকে। কোটি কণ্ঠের বজ্র আওয়াজে সেদিন বাংলার দিগন্ত প্রকম্পিত। টলমল করছে আইয়ুবের সুখের সিংহাসন। অবশেষে মাথা নোয়াতে হলো আইয়ুবকে। এশিয়ার 'লৌহমানব'কে সেদিন বাংলার নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের কাছে মাথা নুইয়ে তাদের নির্দেশ পালন করতে হয়েছিলো। ১১ই ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে ধৃত রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হলো বিনাশর্তে।

ষড়যন্ত্রকারীরাও চুপ করে বসে ছিলো না। ১১-দফার আন্দোলন যখন উচ্চগ্রামে রয়েছে, যখন ১১-দফার সংগ্রামী আহ্বানে গ্রাম বাংলার মাঠে মাঠে মিছিল চলেছে, রক্তের স্বাক্ষরে যখন ১১-দফার ইতিহাস লেখা হচ্ছে, ঠিক তখুনি DAC পিছু ডাক দিলো। 'পিছিয়ে এসো, ১১-দফা নয়, ৮-দফার দাবীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী হরতাল। সারা দেশব্যাপী হরতাল। কিন্তু ১১-দফার সংগ্রামের সংগে এ বিশ্বাসঘাতকতা বাংলার বিপ্লবী জনতা মেনে নেয়নি। ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে ৮-দফার দাবীকে ছাড়িয়ে ১১-দফার দাবীর বজ্র আওয়াজ বাংলা দেশের আকাশ প্রান্তকে বিদীর্ণ করে দিলো।

ঢাকা স্টেডিয়ামে বিরাট জনসমুদ্র। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার সংগ্রামী মানুষ। ৮-দফার ষড়যন্ত্রের হোতা নুরুল আমীন, ফরিদ আহমদকে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াতে দেয়া হলো না। তীব্র ধিক্কারে তাদের বসিয়ে দেয়া হলো। তারপর সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! মানুষের কাঁধে কাঁধে তোফায়েল চলে এলো বক্তৃতা মঞ্চে। উদ্বেলিত উত্তাল জনতা।

বঞ্চিত বাংলার বিদ্রোহী তরুণ গর্জে উঠলো,—"৮-দফা নয়—১১-দফা। ১১-দফার প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। আপোষকারীদের—ষড়যন্ত্রকারীদের এ দেশের মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না।" সংগ্রামী জনতার ক্রুদ্ধ গর্জনে ঢাকার মাটি কেঁপে উঠলো। ৮-দফা নয়—১১-দফা, ১১-দফা"; "আপোষ নয়—সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম।" বিষণ্ণ মলিন মুখে ঢাকার মাঠ থেকে বিদায় নিলো ৮-দফা ষড়যন্ত্রের নায়কেরা। জনতার সম্মুখে ১১-দফার আলোক-বর্তিকা। জনতা ঠিক পথ চিনে নিয়েছে। সঠিক পথে চলেছে জনতার মিছিল—১১-দফার শপথে দৃপ্ত জনতার মিছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী।

বাংলা দেশের ইতিহাসের এক অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় দিন। ঐদিন প্রথম বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনতা শুধুমাত্র দেশপ্রেমকে বুকে বেঁধে, সামরিক বাহিনীর দেয়া সান্ধ্য আইন অমান্য করে। ১৮ই ফেব্রুয়াবী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শাসনের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিনরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে সামরিক-বাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েব পবিত্রতাকে কলুষিত করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েব সম্মুখে সামরিক-বাহিনীর বেষ্টনী। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে নিরস্ত্র বিদ্রোহী ছাত্রেরা। যে-কোন মুহূর্তে হিংস্র সামরিক বাহিনী নিষ্কলুষ তরুণ ছাত্রদের বুকের মাংস খুবলে খাওয়ায় জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহা ছুটে এলেন নিরস্ত্র ছাত্রদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এভাবে তিনি তাদের মরতে দিতে পারেন না। ছাত্রেরা তার কথায় ফিরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ গুলির শব্দ। পায়ে গুলি লেগেছে। পড়ে গেছেন ডঃ শামসুজ্জোহা। তাকে লক্ষ্য করে ছুটে এলো হিংস্র-বাহিনীর পশু ক্যাপ্টেন।

"কে তুমি?" ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন।

"আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের রীডার"—উত্তর দিলেন

আহত ডঃ শামসুজ্জোহা। ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো ক্ষেপে উঠলো জানোয়ারটি। পাশের সিপাহী থেকে রাইফেল টেনে নিয়ে সংগীন দিয়ে ডঃ শামসুজ্জোহার বুক ও পেট চিরে দিলো। গুলি চললো নির্বিচারে। আহত হলেন আরও অধ্যাপক, ছাত্র।

ডক্টর শামসুজ্জোহার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলা দেশে। ঢাকায় চরম উত্তেজনা। মানুষের চোখগুলো জ্বলছে। সান্ধ্য আইনজারী করলো সামরিক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সে-যে তরংগ-বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে তুচ্ছ বালির বাঁধ। সেই রাতে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এক নজীরবিহীন নজীর স্থাপন করলো ঢাকার সংগ্রামী জনতা। নিরস্ত্র জনতা সান্ধ্য আইন অমান্য করে খালি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেনাবাহিনীর ওপর। নির্বিচারে একটানা গুলী চললো। রাইফেল আর মেসিন-গানের একটানা গুলির শব্দ ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ জনতার ক্রুদ্ধ গর্জন। 'খুনের বদলে খুন চাই', 'এগারো দফার আদায় চাই,'—লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের গর্জন ঢাকার রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিলো। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং অগণিত জনতার বুকের তাজা খুনে ঢাকার মাটি লাল হয়ে গেলো। মৃত্যু গর্জে আসছে ; তবু পরোয়া নেই। গুলির আঘাতে সাথীরা লুটিয়ে পড়ছে ; ভ্রূক্ষেপ নেই। রক্তে রক্তে আগুন জ্বলছে ; এগিয়ে চলেছে জনতার মিছিল। হিংস্র পশুর সংগে খালি হাতে মানুষের নজীরবিহীন লড়াই। মৃত্যুকে তারা জয় করেছে। তারা পেয়েছে মুক্তির সন্ধান।

ভয় পেয়ে শাসকগোষ্ঠী সান্ধ্য আইন তুলে নিলো। প্রস্তাব দিলো গোল টেবিল বৈঠকের। বৈঠক বসবে আইয়ুব খান বিরোধী দলগুলির সংগে। তার ভালোবাসার মানুষ নছরুল্লাহ খান দূত হয়ে এলো। শেখ মুজিবকেও বৈঠকে যোগ দেবার অনুমতি মিলেছে। তাকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হবে।

প্যারোলে মুক্তি নিতে অস্বীকার করলেন শেখ মুজিব।

"প্যারোল নয়, শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। না হলে সেনা-বাহিনীর ঐ ব্যাবাক, তোমাদের প্রহসনের রংগমঞ্চ বিচারালয় পুড়িয়ে ছাই করে দেবে বাংলার সংগ্রামী জনতা।" গর্জে উঠলেন অগ্নিবর্ষী মওলানা ভাসানী পল্টনের বিশাল জনসমুদ্রে। 'চলো, চলো, ক্যাণ্টনমেণ্ট চলো।' লক্ষ লক্ষ লোক ছুটলো ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে। রক্তে তাদের আগুন ধরেছে।

এবার শাসকগোষ্ঠী ভীত কুকুরের মতো তাদের লেজ গুটিয়ে নিলো। মাথা নত করলো মুক্তিকামী বাংলার সংগ্রামী জনতার কাছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবকে আগরতলার সমস্ত আসামী সহ মুক্তি দেয়া হলো। শুধু ফিরলেন না একজন সার্জেণ্ট জহুরুল হক। তাকে হত্যা করেছে নরঘাতকেরা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করলো দাম্ভিক কুটিল আইয়ুব সরকার জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হলো অবশেষে। খুলে গেলো জেল-খানার লৌহকপাট। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হলো। 'জেলের তালা ভেংগেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি'। 'জয়, জনতার জয়'। 'জয়' বাংলার জয়'। ঢাকায় সেদিন আতসবাজীর ছড়াছড়ি। আলোকমালায় সজ্জিতা ঢাকা নগরী। শহরে শুধু রংএর খেলা। উদ্দাম উল্লাস। সংগ্রামী মানুষের ইতিহাস স্৺ষ্টিকারী বিজয়। এমনিভাবে বাংলার মুক্তিকামী মানুষেরা শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বারবার ইতিহাস স্৺ষ্টি করেছে। আজ আবার তারা চলেছে এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে, সে ইতিহাস মানুষের মুক্তির ইতিহাস; মানবতার মুক্তির ইতিহাস; সাড়ে সাত কোটি বাংগালীর মুক্তির ইতিহাস।

বংগবন্ধু শেখ মুজিব এখন মুক্ত। রেসকোর্স ময়দানে প্রায় বিশলক্ষ লোকের জনতা তাকে অভ্যর্থনা জানালো। আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বিশাল জনতাকে তিনি জানালেন, তিনি আশাবাদী। আলাপ

আলোচনা এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির সমস্ত পন্থা তিনি পরীক্ষা করতে চান। বংগবন্ধু ঘোষণা করলেন :

"গোলটেবিলে বসে ৬-দফা, ১১-দফা আদায় করে আনবো, অন্যথায় গোলটেবিল বর্জন করবো।"

শেখ মুজিব জনতার রায় নিয়ে গোলটেবিলে যোগ দিতে চললেন।

ঠিক একই সময়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যকরী কমিটির বৈঠক বসলো।

একটিমাত্র আলোচ্য বিষয়- প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমন্ত্রণে তিনি গোলটেবিলে যোগ দিতে যাবেন কিনা? কার্যকরী কমিটির বৈঠকে মওলানা ভাসানী স্পষ্টকণ্ঠে বললেন :

"গোলটেবিলের মাধ্যমে বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবী স্বীকার করে গোলটেবিলে অংশগ্রহণকারী পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত প্রভু এবং পুঁজিপতি শোষকগোষ্ঠী নিজেদের হাতে নিজেদের গলায় ফাঁসীর রজ্জু পরাবে,—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আমার সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি ষড়যন্ত্রকারীদের চিনেছি। আমি তাদের সংগে বেহেশতে যেতেও রাজী নই। জামাতে ইসলামের মওদুদী, পি. ডি. পি.-র নওয়াবজাদা নছরুল্লাহ খান এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলীরা যদি বেহেশতে (স্বর্গে) যায়, আমি আল্লাহর কাছ থেকে আমার জন্যে দোজখ (নরক) চেয়ে নেবো। গোলটেবিল কৃষক-শ্রমিক-জনসাধারণকে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তি আসবে সংগ্রামের মাধ্যমে।"

মওলানা ভাসানী গোলটেবিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গোলটেবিলের পথ ছেড়ে রাজপথ বেছে নিলো। "গোলটেবিল না রাজপথ?—রাজপথ—রাজপথ।"

মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বর্জন করলেন। তবু গোলটেবিল বসলো। পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থের পাহারাদার মধ্যমণি আইয়ুব। তাঁর চতুর্দিক ঘিরে বসলো পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত প্রভু ও পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং তাদের তাঁবেদার নওয়াবজাদা নছরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহম্মদ আলী, দৌলতানা, মওছুদী, নুরুল আমীন, মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ। সুযোগ বুঝে আইয়ুব প্যাঁচ কষলেন; জানালেন, সকলে একমত হয়ে যে দাবী পেশ করবেন, তিনি শুধুমাত্র তা-ই গ্রহণ করবেন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সকলে একমত। শেখ মুজিব ৬-দফা দাবী উত্থাপন করলে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ একবাক্যে বললেন, —'না'।

সুতরাং ৬-দফা, ১১-দফা আদায় হলো না—DAC-এর নেতৃত্ব সমর্থন দিলো না শেখ মুজিবকে। শেখ মুজিব গোলটেবিল বর্জন করলেন; DAC-এর সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। কিন্তু তখন অনেক অনেক দেরি হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং DAC-এর নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তান এবং বাংলা দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের যে সেতুবন্ধ রচিত হয়েছিলো, তা তখন ছিন্ন, দ্বিখণ্ডিত। গোলটেবিলের আলোচনা মূলতঃ ছিলো আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতির সময় নেয়া। সে সময় তারা পেয়েছে; সময়ের সদ্ব্যবহারও করেছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে সৈন্যবাহী দুটি জাহাজ এসে নোঙর করেছে। সুতরাং গোলটেবিলের প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে। আইয়ুব এককভাবে ফরমান জারী করলেন; তিনি দুঃখিত, সব প্রশ্নে গোল-টেবিলের সব নেতা একমত হতে পারেননি। তবে যে বিষয়ে সকলে একমত তা তিনি মেনে নিয়েছেন। আগামী সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যেরা নির্বাচিত হবেন,

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল হয়ে গেলো।

বংগবন্ধু শেখ মুজিব ফিরে এলেন শূন্য হাতে। না, শুধু মাত্র শূন্য হাতে নয়। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আইয়ুবী প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। ঘোষণা করলেন : বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাংলার অপরাপর প্রতিনিধিরা—নুরুল আমীন, মাহ্‌মুদ আলী এবং ফরিদ আহমদের দল। কিন্তু ততক্ষণে মাঠ থেকে ঘরে ফিরে গেছে বাংলার মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষ! শুধু চল্‌ছে ঘরে ঘরে রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন ; আর, এক বিস্ফোরণের অধীর প্রতীক্ষা।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে গেলো। গোলটেবিলের অধিবেশন যখন চলছিলো, তখন মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানে। করাচীতে জনসভায় বক্তৃতা করতে যাওয়ার পথে শাহীওয়াল নামক স্টেশনে কয়েকজন জামাতে ইসলামী সমর্থক মওলানা ভাসানীকে প্রহার করতে করতে টেনে গাড়ী থেকে নামাবার চেষ্টা করলো। স্টেশন কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং উপস্থিত জনতার হস্তক্ষেপে তার প্রাণ রক্ষা হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ওয়ালী খানের ন্যাপ কিংবা নুরুল আমীনের পি. ডি. পি. এর প্রতিবাদ পর্যন্ত করলো না। তাঁরা বললেন : তাদেরই ন্যায় জামাতে ইসলাম DAC-এর অংগ দল। সুতরাং জামাতে ইসলামের কোন গর্হিত কাজেরও কোন প্রকার প্রকাশ্য নিন্দা তারা করবেন না (বগুড়া জেলায় লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা)। প্রকৃতপক্ষে, এদের এই মনোবৃত্তিই বাংলাদেশে জামাতে ইসলামের সংগঠনকে সাহায্য করেছে। এগারো দফা আন্দোলনের চাপে বাংলাদেশে জামাতে ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিলো। ওয়ালী ন্যাপ আট দফার পক্ষে ওকালতি করে প্রকাশ্যে এগারো দফার কৌশলপূর্ণ বিরোধিতা করে এবং জামাতে ইসলামের কর্মীদের DAC-এর বক্তৃতা মঞ্চে অবাধ

সুযোগ দিয়ে বাংলা দেশে জামাতে ইসলাম এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় দিয়ে জীইয়ে রাখে। বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামে ওয়ালী ন্যাপের এই ভূমিকা চিরদিন প্রশ্নযোগ্য হয়ে থাকবে।

সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো পাকিস্তানী শাসকচক্র। তারা জনতাকে সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারও দিতে প্রস্তুত নয়। গণতন্ত্রের অধিকার জনতার সামান্যতম অধিকার। সেই অধিকার শোষকশ্রেণী কর্তৃক বাংলা দেশকে অবাধ লুণ্ঠনের পরিপন্থী। সুতরাং পাকিস্তানে গণতন্ত্র অসম্ভব। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ইয়াহিয়া খানকে আসরে নামানো হলো।

১৯৭০ সালের ২৫শে মার্চ।

আইয়ুবকে সরিয়ে দেয়া হলো। ধ্বসে পড়লো আইয়ুবশাহী ইমারত। জেনারেল ইয়াহিয়া খান হলেন স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট। পাকিস্তানের ঘোরতর অরাজকতার দিনে স্বর্গীয় দূতের আবির্ভাব! পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণীর নির্বাচিত স্বর্গীয় দূত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। সামরিক শাসন জারী হলো। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের পুনরাবৃত্তি। একই কথা, একই সুর। স্বৈরাচারের খোলস বদল হলো। শুরু হলো পাকিস্তানের ইতিহাসের কৃষ্ণতম এবং শেষ অধ্যায়।

স্বাধিকার সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইয়াহিয়া যখন ক্ষমতা দখল করে, তখন পূর্ব দিগন্তে বিপ্লবের অগ্নিশিখা; যে শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। কারখানায় কারখানায় চল্‌ছে মওলানা ভাসানী নির্দেশিত ঘেরাও আন্দোলন। গ্রামে গ্রামে কৃষক-বিক্ষোভ, কোন কোন স্থানে গণ-আদালতে চল্‌ছে দুষ্কৃতির বিচার।

ক্ষমতায় এসেই ইয়াহিয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপ বে-আইনী ঘোষণা করলো। কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এ জ্ঞান শাসকগোষ্ঠীর ছিলো। সুতরাং সংগে সংগে ঘোষিত হলো, জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখল করে থাকার কোন প্রকার অসাধু ইচ্ছা নেই। অবিলম্বে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে, তিনি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ধন্য ধন্য করে উঠলো পাঞ্জাবী শাসকচক্রের দালালগোষ্ঠী। ইয়াহিয়া মহামানব (?)। শ্রমিকদের ধর্মঘট, ঘেরাও আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হলো। বাংলাদেশ আর পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না, অন্যথায় চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। মহানুভব ইয়াহিয়া খানই সব বৈষম্য দূর করবেন। কারো বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না, শুধুমাত্র ১১-দফা আন্দোলনের সময়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছেন, তাদের সামরিক আদালতে ন্যায্য বিচার করা হবে। সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে সশ্রম কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত, বিশেষ সামরিক আদালত মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। সামরিক আদালতের 'ন্যায্য বিচারে' শত শত রাজনৈতিক কর্মীর জেল, জরিমানা, বেত্রাঘাত ইত্যাদির ব্যবস্থা হলো। ফলে বাংলা দেশে চাপা অসন্তোষ আবার দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। সামরিক সরকার হুঁশিয়ার হলো ফরমান জারী করলেন: শীগ্‌গিরই তারা নির্বাচন দিচ্ছেন। রাজনৈতিক

কার্যকলাপও বৈধ ঘোষণা করা হলো। তবে কিন্তু রইলো একটি। প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে পারবেন; কিন্তু অপর রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তির সমালোচনা করতে পারবেন না। অন্যথায়, সামরিক আইনে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা।

পাঞ্জাবী শোষকগোষ্ঠীর দালালদের সামরিক আশ্রয় দেয়া হলো। বাংলা দেশের রাজনীতি থেকে যে মওদুদী, ফরিদ আহমদ, মাহমুদ আলীর দলকে ১১-দফা আন্দোলন আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিলো, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কবলো সামরিক আইন। শুধু পুনর্বাসন নয়, তাদের শক্তি বর্ধনের সুবিধেও করে দিলো। জামাতে ইসলাম মসজিদে, ধর্মসভার নামে প্রচার শুরু করলো, যারা দুই অঞ্চলের বৈষম্যের কথা তুলে মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তারা ইস্‌লামের দুশ্‌মন; যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে তারা খোদাদ্রোহী। এদের হত্যা করলে অশেষ পুণ্যলাভ ঘটবে। মওদুদী আরও এক ধাপ এগুলেন। তিনি ফতোয়া (ধর্মীয় বিধান) দিলেন, "বেহেশ্‌তে মুসলমানদের যে হুর (স্বর্গ অপ্সরী) দেয়া হবে সম্ভোগের জন্যে, তারা সংগৃহীত হবে বিধর্মী সুন্দরী ষোড়শীদের মধ্যে থেকে।"

মওদুদীর এই ঘৃণ্য ন্যক্কারজনক সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার সেদিন পাকিস্তানের মোল্লা সম্প্রদায়ও হজম করতে পারেননি। পশ্চিম পাকিস্তানী মোল্লা, মুফ্‌তী মাহমুদের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তান এবং বাংলা দেশের মোল্লা সম্প্রদায় এক যুক্ত বিবৃতিতে মওদুদীর নিন্দা করে তাকে পাল্টা 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করলেন।

আসর জমাতে পারলো না জামাতে ইসলাম। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ৬-দফার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠলো। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী, বাংলা দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে আবার বাংলা দেশের মানুষ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। 'নির্বাচন চাই', 'গণতন্ত্র দিতে হবে'। 'সামরিক শাসন প্রত্যাহার করো।'

'জন-প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দাও।' বাংলা দেশের মানুষ দৃঢ়কণ্ঠে দাবী জানালো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা দেশের মানুষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে লড়ে চলেছে। কারণ, পাকিস্তানে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই বাংলা দেশের মুক্তি নিহিত ছিলো, ঊনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগস্টের পর পরই সাম্প্রদায়িক হাংগামার আশংকায় বাংলা দেশের ধনবান জমিদার, মহাজন এবং বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা ভারতে চলে গেলেন। বাংলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা ছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর, অর্থনৈতিক দিক থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র। বাংলা দেশে মুসলমান জমিদার যে ছিলো না এমন নয়, তবে আর্থিক দিক থেকে তাঁরা ছিলেন ফাঁপা এবং ঋণগ্রস্ত। পাকিস্তান হবার আগে বাংগালী মুসলমান শিল্প কিংবা ব্যবসার ক্ষেত্রে কখনও বিশেষ এগোবার চেষ্টা করেননি, অবশ্য এর অন্যতম কারণ, তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে পশ্চিম-পাকিস্তানে ছিলো বিরাট বিরাট জায়গীরদার, নবাব, জমিদার এবং সামন্ত প্রভু। ব্যবসা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এঁরা আসর জাঁকিয়ে বসলেন। এদের সংগে এসে যোগ দিলেন ভারত থেকে আগত মুসলমান ব্যবসায়ী, বিত্তশালী লোকেরা। পশ্চিম পাকিস্তানী নবাব, জায়গীরদার, জমিদার, ব্যবসায়ীরা এবং ভারত থেকে আগত বিত্তশালী অবাংগালী ব্যবসায়ীরা এক অশুভ চক্র গড়ে তুলে পাকিস্তানের সমগ্র অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করলো।

বেসামরিক চাকুরীর ক্ষেত্রেও পাকিস্তানে বাংগালী মুসলমানের অবস্থা ছিলো নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে বাংগালী মুসলমান ছিলো না বললেই হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যে-সব মুসলমান ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই অবাংগালী। ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে এদের আত্মিক যোগাযোগ পশ্চিম-

পাকিস্তানের সংগে। সুতরাং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বেসামরিক চাকুরীর ক্ষেত্রে সমস্ত উচ্চপদে—সেক্রেটারী, জয়েন্ট-সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হলেন ভারত থেকে আগত মুসলমান আই. সি. এস এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদার, জমিদার আর অভিজাত সম্প্রদায়ের নন্দনেরা। এছাড়াও পরবর্তীকালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে (ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ) যাদের নিয়োগ করা হলো তাদেব মধ্যেও অনেকে ভারত থেকে আগত অথবা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলা দেশে চালান দেয়া বাংলা দেশের 'ডোমিসাইল্ড' সার্টিফিকেটধারী অবাংগালী মুসলমান। এঁরা বাংলা দেশের জন্যে প্রাপ্তিযোগ্য নির্দিষ্ট করা সংখ্যা (QUOTA) থেকে নিযুক্ত হলেন, ফলে পাকিস্তান সেণ্ট্রাল সুপিরিয়ব সার্ভিসে বাংগালীরা হয়ে গেলো ভীষণভাবে কোনঠাসা এবং পাকিস্তানের প্রশাসন যন্ত্র দখল করে বসলো পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যুরোক্রেট্‌স্‌রা (আমলারা)।

সামরিক বাহিনীর উচ্চপদে ছিলো ভারত থেকে আগত অবাংগালী মুসলমান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত শ্রেণীর সন্তানেরা। জেনারেলের পদ এবং লেফটেনাণ্ট জেনারেলের পদ দূরে থাকুক মেজর জেনারেলের পদ পর্যন্ত পৌছুতে পেরেছেন মাত্র দুজন বাংগালী। তার মধ্যে একজন খাজা ওয়াসিউদ্দীন উর্দুভাষী বাংগালী, যিনি বাংলা ভাষা জানেন না। অন্যজন মেজর জেনারেল মজিদ; আইয়ুব খান থেকে সিনিয়র হবার অপরাধে চাকুরী থেকে বিতাড়িত। সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাংগালী অফিসারের সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচ জন; (পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসার কর্ণেল কুদ্দুস ও লেফটেনাণ্ট কর্ণেল কলিমুল্লাহ কর্তৃক ১৯৬৭ সালের ১৯শে এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ) পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সাধারণ সৈনিকের মধ্যে বাংগালীর সংখ্যা আরো নগণ্য।

নানা অজুহাতে সামরিক বিভাগে বাংগালীদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হলো। ফলে সামরিক প্রশাসনযন্ত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সর্বময় প্রভুত্বই কায়েম হয়ে রইলো।

পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি, ব্যবসায়ীশ্রেণী, ব্যুরোক্রেসী (আমলাতন্ত্র) এবং সামরিক বাহিনী—এই তিন দলের বাংলাদেশ সম্পর্কে উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ মূলতঃ ছিলো এক এবং অভিন্ন—বাংলা দেশকে শোষণ করা এবং তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা। এই তিনদলের সমবায়ে গঠিত অশুভ চক্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে; বাংলা দেশকে তার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে; বাংলা দেশকে নির্মমভাবে লুণ্ঠন করেছে। এদের হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে বাংলাদেশের মানুষের না ছিলো আর্থিক সংস্থান, না ছিলো সামরিক শক্তি। বাংলা দেশের একমাত্র সম্বল ছিলো তার জনবল—পাকিস্তানের লোকসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন অধিবাসী। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলেই এই শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্তবাদী পুঁজিপতিদের শোষণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। বাংলা দেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবী আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী ছিলো পরস্পর সম্পৃক্ত। তারই জন্যে বাংলা দেশের মানুষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করেছে, রক্ত দিয়েছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তবাদী, পুঁজিপতি শ্রেণী, আমলা আর সামরিক নায়কেরা বাংলা দেশকে শোষণ করার পথ নির্বিঘ্ন রাখার জন্যে গণতন্ত্রকে টুটি চেপে হত্যা করেছে; গণতন্ত্রকে পাকিস্তানের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে। অবশেষে গণতন্ত্রের শেষ সংগ্রামে বাংলা দেশকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছে।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন থামলেও তাই বংগবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলো। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী দাবী করে বসলেন—কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী

সব শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি নিয়ে সংবিধান রচনা করতে হবে। সংবিধান রচনার জন্যে তিনি নির্বাচন চাইলেন না; তিনি চাইলেন সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের কনভেনসন। আইয়ুবের পতনের ইতিহাস মহানুভব (?) ইয়াহিয়ার জানা ছিলো। তিনি ঘোষণা করলেন, নির্বাচন হবে। শুধু নির্বাচন হবে এমন নয়, নির্বাচন করতেই হবে, ইয়াহিয়া গণতন্ত্র ফিরিতে দিতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। সুতরাং নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রচারণা পর্যন্ত চলবে না। পাকিস্তানের মানুষকে নির্বাচন করতেই হবে, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতেই হবে, সামরিক শাসকের নির্দেশে। প্রয়োজন হলে সংগীনের মাথায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এই অপূর্ব মহান (?) নির্দেশে সংগ্রামী জনতা দ্বিধাগ্রস্ত। তবু চললো নির্বাচনী তোড়জোড়। আবার ফরমান জারী হলো: 'মহামতি' ইয়াহিয়া খানের ফরমান। Legal Frame Work Order —আইনানুগ কাঠামো আদেশ। ইয়াহিয়া গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিচ্ছেন। জনগণের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সংবিধান রচনা করবেন, কিন্তু সংবিধানে কেন্দ্রকে কিছুতেই দুর্বল করা চলবে না। পাকিস্তানের ঐক্য বা সংহতি বিনষ্টকারী কোন সংবিধান রচনা করা চলবে না। জাতীয় পরিষদ আহ্বানের এক শ' কুড়ি দিনের মধ্যে পাকিস্তানের নয়া সংবিধান তৈরী করতে হবে, অন্যথায় প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ বাতিল করে দেবেন। শুধু তাই নয়, জাতীয় পরিষদে গৃহীত সংবিধান যদি প্রেসিডেন্টের ইচ্ছানুযায়ী না হয়, তবে তিনি সংবিধানে স্বাক্ষর নাও দিতে পারেন, এবং সে-ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু কবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে —এই কথা বলতে ইয়াহিয়া বেমালুম ভুলে গেলেন। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন! আইয়ুবের ছিলো 'মৌলিক গণতন্ত্র', আর ইয়াহিয়া খানের হলো 'সামরিক গণতন্ত্র'!

ইয়াহিয়া খান ভেবেছিলেন, শেখ মুজিব কিছুতেই জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেন না। সুতরাং সংবিধান

তৈরী করতে গিয়ে তাকে বাধ্য হয়ে অন্য দলের ওপর নির্ভর করতে হবে। সংবিধান তৈরী করতে পরস্পর কলহ অবশ্যম্ভাবী এবং ইন্ধন দিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে কলহ বৃদ্ধি করিতে পারলে, এক শ' কুড়ি দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা, কিছুতেই সম্ভবপর হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সংবিধান যদি রচিতও হয়, তথাপি সংবিধানে কেন্দ্রকে দুর্বল করা হয়েছে কিংবা পাকিস্তানেব সংহতি বিনষ্ট করা হয়েছে—এই অজুহাতে জাতীয় পরিষদ ভেংগে দেবার মোক্ষম অস্ত্র তো তার হাতে রইলোই।

শেখ মুজিব আস্থা স্থাপন করলেন বাংলা দেশের জনতার ওপর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, নির্বাচনে বাংলা দেশের সমগ্র জনতা তাঁর দলের পেছনে দাঁড়াবে এবং তিনি লাভ করবেন একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা। জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলে সামরিক সরকার বাধ্য হবে তাঁর ছয় দফা দাবী মানতে। বাংলা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ঘটবে এই নির্বাচনেব মাধ্যমে। জনতার রায় চাই। সুতরাং তিনি নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ছয় দফার স্বপক্ষে জোর প্রচার করলেন। শেখ মুজিব যে শাসক-চক্রের সঠিক রূপ চিনতে ভুল করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। এ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিলো না। নির্বাচন বয়কট করে, সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে অপ্রস্তুত জনতাকে ঠেলে দিতে তিনি ছিলেন নারাজ। বিশেষতঃ, শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তোরণের কর্মসূচীই ছিলো তাঁর দলীয় কর্মসূচী।

মওলানা ভাসানী প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, পরে তিনিও নির্বাচনের স্বপক্ষে রায় দিলেন। নির্বাচনের প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর ন্যাপ দ্বিধা-বিভক্ত হলো। তোয়াহা এবং আব্দুল হকের নেতৃত্বে এক অংশ নির্বাচন বয়কট করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে, ন্যাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলো ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর : ২৮শে নভেম্বর নির্বাচন। আরম্ভ হলো নির্বাচনী তোড়জোড়। কিন্তু নির্বাচন হলো না ঐ তারিখে। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেলো বাংলা দেশের দক্ষিণপ্রান্ত দেশ। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের মহা প্রলয়। হাতিয়া, সন্দ্বীপ, রামগতি, পটুয়াখালী ভোলা, মহেশখালী ও চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব-লীলায় কয়েক লক্ষ লোক প্রাণ হারালো। বাড়ীঘর, গো-বাছুর ধুয়ে মুছে নিয়ে গেলো সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা, সম্পদহারা। সারা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠলো। পাকিস্তানেব এক অংশে ধ্বংসেব মহামারী, অথচ শক্তিশালী কেন্দ্র নীরব। ইয়াহিয়া খান চীন থেকে ফিরবাব পথে হেলিকপ্টারে আকাশে উড়ে পিণ্ডি ফিরে গেলেন। বাংলা দেশের দুর্গত মানুষের সংগে মাটিতে নেবে দুটো কথা বলবার অবসর পেলেন না শক্তিশালী কেন্দ্রের মহানুভব প্রেসিডেণ্ট। প্রথম সাহায্য মঞ্জুর করলো ভারতীয় পার্লামেণ্ট। তবু লজ্জা হলো না পাক সরকারেব। করাচী বিমান বন্দরে পাকিস্তানী হেলিকপ্টার মওজুদ আছে, তা পাঠানো হলো না বাংলা দেশের দুর্গত মানবদের রিলিফ দ্রব্য পৌঁছানোর জন্যে। বিদেশে হেলিকপ্টাব চেয়ে পাঠানো হলো। বাংলা দেশের অর্থপুষ্ট সামরিক বাহিনীকে ত্রাণকার্যে লাগানো হলো না, দুর্গত মানবের ত্রাণকার্যে এলো বিদেশী সৈন্য। রিলিফ গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হলো লাহোরে, যদিও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে বাংলা দেশ। রিলিফের টাকা জমা হতে লাগলো লাহোরে। রিলিফ দ্রব্য করাচীতে নাবিয়ে প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করা হলো।

গর্জে উঠলেন মওলানা ভাসানী। জীবনের প্রান্তদেশে এসে তাঁর উপলব্ধি ঘটলো, বাংলাদেশ—বাংলাদেশ, আর পশ্চিম পাকিস্তান হলো পশ্চিম পাকিস্তান। এ দু'অংশের নাড়ীর যোগ নেই।

মানব-দরদী মওলানা ভাসানী সেদিন নিদারুণ আক্রোশে স্বহস্তে নিজ অংগচ্ছেদ করলেন। একদিন পাকিস্তান ভিত্তিতে তিনি নিজে যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, সে সংগঠন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে ছাটাই করে দিলেন। দ্বিধাহীন চিত্তে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'এ নির্বাচন আমি মানি না, এ নির্বাচন আমি বয়কট করলাম। যারা আমাব দেশের মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিশীল নয়, তাদের সংগে আব কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতে আমি রাজি নই। পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন নয়, বাংলা দেশেব স্বাধীনতাই আজ থেকে বাংলার মানুষেব একমাত্র দাবী। আমি ঐ পশ্চিমা শোষকশ্রেণীর সঙ্গে আব বেহেশ্‌তে যেতেও রাজী নই।' বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ শরীর নিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী নেতা মওলানা ভাসানী ছুটলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মুক্তির দাবি নিয়ে। ডাক দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে।

২৬শে নভেম্বর বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘূর্ণিবাত্যা এলাকা সফর করে এসে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। সম্মেলনে তীব্র ধিক্কার দিয়ে কঠিনকণ্ঠে তিনি অভিযোগ আনলেন, পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে "সরকারের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ও ত্রাণকার্যে সম্পূর্ণ অক্ষমতা ক্ষমার অযোগ্য। ······চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও যদি ত্রাণ-সাহায্যের ব্যবস্থা হতো, তাহলে হাজার হাজার মানুষ রক্ষা পেতো।

পূর্ব-বাংলার এই দুর্দিনে পশ্চিম পাকিস্তানীরা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন বটে, কিন্তু তেমনভাবে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের মিলগুলি পূর্ব-বাংলা থেকে আখের গুছিয়ে নিতে রাজী, কিন্তু একগজ কাপড় দিয়ে পূর্ব-বাংলার ভাই-বোনেদের সাহায্য করতে রাজী নন।······এই জন্যেই কি আমাদের ৭২ ভাগ সম্পদ গত দু' দশক ধরে তাদের ভোগ করতে দিয়েছি? এই জন্যেই কি প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের ৬০ শতাংশ বাজেট মঞ্জুর

করেছি? এই জন্যেই কি বাংলা দেশের পাটচাষীরা নিরন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করছে? আর করাচী এবং লায়ালপুরের পুঁজিবাদীরা আমাদের শোষণ করে সম্পদের পাহাড় জমিয়েছে? আজ কোথায় জাতীয় সংহতির সেই প্রবক্তাগণ······ইসলামাবাদের প্রমোদ-অট্টালিকা নির্মাণের জন্যে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হোতে পারে,—কিন্তু বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যা থেকে স্থায়ী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে ২০ কোটি টাকার বেলায় অর্থাভাবের নজীর দেখানো হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটা পরিকল্পনাও তৈরী হয় না বাংলাদেশে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে মংগলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণের জন্যে এক কোটি ডলারের বেশী খরচ হতে পারে।" শেখ মুজিব এই অন্যায়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে ৬-দফা ১১-দফার ভিত্তিতে নির্বাচনকেই বেছে নিলেন: "আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলা থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে এবং বাংলাদেশের মানুষদের সমৃদ্ধির জন্যে ৬-দফা' ১১-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তোলা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা আজ আমাদের হাতেই তুলে নিতে হবে।" শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করলেন।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংসলীলার প্রতি পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা, বাংলাদেশকে শোষণের নগ্নতা দেখে শেখ মুজিব সংগ্রামের ডাক দিলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে। নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি চাইলেন জনতার রায়; আর মওলানা ভাসানী ডাক দিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে সংগ্রামের।

মওলানা ভাসানীর ডাকে নির্বাচন বয়কট করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো না, বংগবন্ধু শেখ মুজিবের নির্বাচনের দাবীই অগ্রাধিকার পেলো। নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। বাংলার

মানুষ শেখ মুজিবের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রকে গ্রহণ করলো। কারণ, তাতে ছিলো বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ; ছিলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রূপকল্পে এক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হলো —"এমন একটা যথার্থ সজীব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে জনগণ স্বাধীনতা এবং মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করতে পারবে এবং ন্যায় ও সাম্য বিরাজ করবে।"

ঘোষণাপত্রে বলা হলো,—"অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সহ প্রতিটি নাগারকের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের— এ কথার স্বীকৃতি শাসনতন্ত্রে থাকবে।"

রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রসংগে বলা হলো,—"পাকিস্তান হবে অংগ রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকটিকে ৬-দফা ফরমূলার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানকারী ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র)।

১নং দফা ঃ

"সরকারের ধরণ হবে ফেডারেল এবং পার্লামেণ্টারী। এতে ফেডারেল আইনসভার এবং ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিটগুলোর আইনসভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ফেডারেল আইনসভার প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।"

২নং দফা ঃ

"ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে কেবলমাত্র দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয় এবং নীচে ৩নং দফার শর্তাধীনে মুদ্রা।"

৩নং দফা ঃ

"দেশের দুইটি অংশের জন্যে দুইটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়-যোগ্য মুদ্রা থাকবে, অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থাসহ দুই অঞ্চলের জন্যে একই মুদ্রা থাকবে। এতে আঞ্চলিক ফেডারেল ব্যাংক থাকবে। এই ব্যাংকগুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর করবে এবং মূলধন পাচার বন্ধের ব্যবস্থা করবে।"

৪নং দফা ঃ

"রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা অংগরাষ্ট্রগুলোর হাতে থাকবে। দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দপ্তর পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় রাজস্ব ফেডারেল সরকারকে দেয়া হবে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে উক্ত রাজস্ব আদায়ের সংগে সংগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ফেডারেল সরকারের তহবিলে জমা হবে। করনীতির ওপর অংগরাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের সংগে সংগতি রেখে ফেডারেল সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।"

৫নং দফা ঃ

"ফেডারেশনের অন্তর্গত অংগ রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসেব রাখার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য-হারের ভিত্তিতে অংগরাষ্ট্রগুলো ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। ফেডারেল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠামোর মধ্যে থেকে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা ও চুক্তির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে দেয়া হবে।"

৬নং দফা ঃ

"কার্যকর ভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের অংগরাষ্ট্রগুলোকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া রাখার ক্ষমতা দেয়া হবে।"

ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে নির্বাচনী ঘোষণা হলো— "ফেডারেল সরকারের সকল শাখায় ও ফেডারেল সার্ভিসে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব লাভের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে শাসনতান্ত্রিক সংবিধান থাকতে হবে। স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল অঞ্চলগুলো, বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বর্ধিতহারে লোক বিনিয়োগের মাধ্যমে যত সত্বর সম্ভব বর্তমানের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের অবসান করা হবে। প্রাথমিক সংশোধনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে করাচীতে অবস্থিত নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হবে।"

ঘোষণাপত্রে আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তি বর্ণিত হোলো—"শোষণমুক্ত একটা ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজগঠন করাই এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এটা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপকল্প—যাতে অর্থনৈতিক অবিচার দূরীকরণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই সমৃদ্ধির ফল যথাযথ বণ্টনের বিধান থাকবে। যে সমাজে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যের অতল তলে নিমজ্জিত এবং জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো থেকে বঞ্চিত, সেখানে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য। আমাদের সমাজের নবজাতকের সংখ্যার উর্ধ্বগতি ও মৌলিক সম্পদের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনে বিরামহীন সংগ্রাম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। আমাদের কাজ হলো গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধন। সংগ্রাম ও ত্যাগ ব্যতীত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং ন্যায়পরায়ণ সমাজ বা রাষ্ট্রগঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া মিথ্যে অংগীকারের সামিল।

দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্য অর্জনের অংগীকারে নিজেদের আবদ্ধ করে আমরা দেশবাসীকে প্রকৃতপক্ষে বিরামহীন

সংগ্রাম ও সব রকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, দেশের সকল স্তরের মানুষ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সমানভাবে ত্যাগের বোঝা বহন করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ফলও সমানভাবে ভোগ করবে—এই নিশ্চয়তা দিতে পারলেই আমরা তাদের কাছে এই আহ্বান জানাতে পারি। অতীতে অধিকতর দবিদ্র মানুষ এবং দরিদ্রতর অঞ্চলগুলোকে দিয়ে, এই ত্যাগের বোঝা বইয়ে নেয়া হয়েছে এবং নগণ্য সংখ্যক সুবিধাভোগী অর্থনৈতিক উন্নতির ফসল ঘরে তুলেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির এই অন্যায় পন্থাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করি।

সামাজিক অসাম্যের গোড়ায় এমন একটা ত্রুটিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে যা ব্যক্তিগত উদ্যমকে অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র বাহনে পরিণত করে। ব্যক্তিগত মুনাফার পথ ধরে দেশের সম্পদ অপরিহার্যভাবেই মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হয় এবং অর্থনীতির মূল সেক্টরগুলো শক্তিশালী 'কোটারির' হাতে চলে যায়: এটা সামাজিক সুবিচার ও সাম্যের লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব করে তোলে। তাই জাতীয়করণ, সরকারী সেক্টরের সম্প্রসারণ, সমবায় সংগঠনগুলোর উন্নয়ন এবং শিল্প-কারখানার ব্যবস্থাপনা ও মালিকানায় শ্রমিকের অংশীদারত্বের মতো নয়া প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবনের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির বর্তমান প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন দরকার। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের জন্যে পরিকল্পিত নির্দিষ্ট নীতিগুলো নিম্নরূপ হবে:

সরকারী খাত ও জাতীয়করণ:

শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান ট্যাক্স ধার্য করে এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেই সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এবং অর্থনীতির প্রধান সেক্টরগুলোর নিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে সুবিধাভোগী কোটারিকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। কার্যকর ভাবে এই সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করার জন্যে

অর্থনীতির প্রধান সেক্টরগুলোর জাতীয়করণ এবং ভবিষ্যতে মূল সেক্টরগুলোর সরকারী খাতের আওতাভুক্ত করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সামাজিক ন্যায়-বিচারের অভিলক্ষ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে এই ধরণের জাতীয়করণের কর্মসূচী গ্রহণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্ব-শর্ত। অবশ্য, অত্যন্ত সুসমঞ্জস পরিকল্পনা সহকারে জাতীয়করণ-কর্মসূচী রূপায়ন করতে হবে। প্রশাসনিক কর্মচারীর এবং সর্বোপরি দক্ষতার উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয়করণের মাত্রা, গতি ও গঠনবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হলে মূল্য-নির্ধারণ নীতির ত্রুটি এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংগঠনগুলো অদক্ষতায় আক্রান্ত হতে পারে—সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা এবং এটা সুস্পষ্টই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংগঠনগুলোর পরিচালনার জন্যে নতুন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সবচেয়ে ভাল পেশাদার কর্মচারী নিয়োগ করলে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সর্বোচ্চমানে পৌঁছানো যেতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে জাতীয়করণের জন্যে অগ্রাধিকারের তালিকাটি নীচে দেওয়া হলো ঃ

১। ব্যাংকিং।

২। বীমা।

৩। লোহা ও ইস্পাত, খনি, মেসিন, যন্ত্রপাতি, ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং, পেট্রো-কেমিক্যাল, সার, সিমেন্ট, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সহ ভারী শিল্প।

৪। বৈদেশিক বাণিজ্য—বিশেষতঃ নিম্নলিখিত পাট ও তূলা ছাড়াও লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, খাদ্যশস্য, সিমেন্ট এবং সারসহ প্রধান প্রধান পণ্যের আমদানী-রপ্তানী।

৫। পাট ব্যবসা।

৬। তূলা ব্যবসা।

৭। শিপিং সহ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তঃ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ।

৮। পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিতব্য অপরাপর মূল শিল্প-কারখানা।

ক্রমবর্ধমান কর ঃ

দেশের বর্তমান কর-প্রথায় মুষ্টিমেয় বিশেষ সুবিধেভোগীর প্রতি চিরাচরিত আনুকূল্যই প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই কর-প্রথা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎমুখী। উচ্চতর উপার্জনকারী শ্রেণীর ওপর ধার্য-করের বোঝা আন্তর্জাতিক মানের হিসেবে সবচাইতে কম। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সাধারণ মানুষের স্কন্ধে পরোক্ষ করের মাধ্যমে যে বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার জায়গায় প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে অর্থ আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে কর কাঠামোর আমূল রদবদলের প্রয়োজন। এজন্যে আয়করে একটি সত্যিকারের ক্রমবর্ধমান প্রথা প্রচলন এবং মূলধনের লাভ (capital gains), মুনাফা, সম্পদ, উপহার ও উত্তরাধিকারের ওপর থেকে মোটা পরিমাণের ট্যাক্স আদায় করা আবশ্যক। উপরন্তু বর্তমানে প্রচলিত 'ছাড়' (Deduction), অব্যাহতি (Exemptions) এবং 'ট্যাক্স হলিডে' প্রথা সামাজিক অসাম্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে সাহায্য করছে। এ সকল বিষয়ে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং উপরোল্লিখিত সামাজিক অভিলক্ষ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়—এ ধরনের 'ছাড়', 'অব্যাহতি' ও 'ট্যাক্স হলিডে' প্রথা দূর করতে হবে।

আন্তঃ-আঞ্চলিক ও অন্তঃ-আঞ্চলিক বৈষম্য ঃ

গত ২৩ বছরেরও বেশী সময় ধরে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার এবং বৈদেশিক মুদ্রা

ও সাহায্যেব সিংহভাগ পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যবহারেব দরুন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেব মধ্যে আন্তঃ-আঞ্চলিক বৈষম্য আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গেছে। পাকিস্তানেব উভয় অঞ্চলেই এবং প্রত্যেক অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকাব মধ্যে বৈষম্য বযেছে। ন্যাযবিচাবেব খাতিবে পাকিস্তানেব অধিক উন্নত অঞ্চলগুলো থেকে স্বল্পোন্নত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পবিমাণে সম্পদ স্থানান্তব কবা উচিত এবং আন্তঃ-আঞ্চলিক ও অন্তঃ-আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ও পবিশেষে নির্মূল কবাব উদ্দেশ্যে ফেডাবেশনেব ইউনিট সবকাবগুলোকে নীতি গ্রহণ কবতে হবে।

মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা ঃ

জনগণ তাদেব মৌলিক প্রযোজনীয জিনিসপত্র যাতে পেতে পাবেন, তাব ব্যবস্থা কবা বাষ্ট্রেব মৌলিক দাযিত্ব—এই নীতি অনুসবণ কবে বিপুল পবিমাণে পণ্য মওজুদ, বণ্টন ও গুদামজাত কবাব এবং সর্বোপবি অর্থ-সাহায্যেব (সাবসিডি) মাধ্যমে যাতে জনগণ সব সমযে ন্যায্য মূল্যে মৌলিক প্রযোজনীয জিনিসগুলো পেতে পাবেন, তাব নিশ্চযতা বিধানেব জন্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হবে। প্রথমেই যে-সব প্রধান প্রধান পণ্যকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে, তাব মধ্যে থাকবে চাল, গম, লবণ, কেবোসিন, খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য তেল ও মোটা সুতী কাপড়।

মনোপলি ও কার্টেল ঃ

মনোপলি (একচেটিয়া ব্যবসায়) ও কার্টেল (দাম বেঁধে দেয়াব উদ্দেশ্যে বণিকদেব আঁতাত) প্রথা মূলতঃ ন্যায় ও সাম্য-নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠাব দুশ্‌মন এবং সেজন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোগত যে পরিবর্তন উদ্ভাবন কবা হয়েছে, তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মনোপলি ও কার্টেল প্রথাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার নিশ্চয়তা দেবে।

বিলাস দ্রব্যের ওপর বিধিনিষেধ ঃ

দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিব জন্যে প্রয়োজনীয় ত্যাগের সমান

অংশীদারত্বের মূলনীতি অনুসরণে বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। কতিপয় ভাগ্যবানকে যথেচ্ছ পরিমাণ বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের প্রশ্রয় দিয়ে, মেহনতি মানুষের প্রতি ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানানো অন্যায়। বিলাস পণ্যের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করার জন্যে যে সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তাতে থাকবে ঃ

(ক) বিলাস দ্রব্যের আমদানির ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ;

(খ) দেশে বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ ;

(গ) জনগণের আশ্রয়স্থলের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিলাসবহুল ও জাঁকালো দালান নির্মাণের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির চাপে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কেবলমাত্র অর্থমঞ্জুরী নহে ; প্রকৃত মজুরীর মান রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যেই ওপরে বর্ণিত মূল্য স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্প ঃ

অতীতে শিল্প-উন্নয়নের জন্য গৃহীত নীতিগুলো সমাজের প্রয়োজন মিটানোর দিকে বড় একটা নজর দেয়নি। আমাদের সমাজের শিল্পোন্নয়নের মূল লক্ষ্য হবে ঃ

(ক) উৎপাদনশীল সরঞ্জাম (Capital goods) ও ভোগ্য পণ্যের মূল আবশ্যকতা পুরণার্থে একটি শৈল্পিক ভিত্তি স্থাপন।

(খ) মৌলিক আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্যে বৈদেশিক সূত্রের ওপর বিপজ্জনক নির্ভরশীলতা হ্রাস।

(গ) কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অতীতের নীতিগুলো শুধু ব্যর্থই হয়নি, উপরন্তু বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক ঋণ সহ দুষ্প্রাপ্য সম্পদগুলোর বিপুল অপচয় ঘটিয়েছে। মৌলিক ও সামাজিক লক্ষ্য

অর্জন ত্বরান্বিত করার জন্যে পরিকল্পিত শিল্পায়নের নয়া বাস্তবায়ন কৌশলের রূপরেখা নীচে দেওয়া হলো :

ভারী ও বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা :

রাষ্ট্রায়ত্ত খাত :

ভারী ও বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার জাতীয়করণের ক্ষেত্রে উপবোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অ-রাষ্ট্রায়ত্ত খাত :

যে-সব বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণ করা হয়নি, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা সংস্থাগুলো কর্তৃক আরোপিত শৃংখলার অধীন থাকবে।

ব্যবস্থাপনা ও ইকুইটি মূলধনে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব :

যে সমস্ত শিল্প-কাবখানা সত্বর জনগণের মালিকানাধীনে আনা হবে না, সরকাব ক্রমবর্ধমান হারে তাদের 'ইকুইটি' মূলধন দখল করবে। সরকার যেটুকু 'ইকুইটি' মূলধন আয়ত্ত করবে, সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা যৌথভাবে সেই পরিমাণ অংশের মালিকানা লাভ করবে এবং সেই পরিমাণ অংশের মুনাফার ভাগ পাবে। শ্রমিকরা কেবল 'ইকুইটি' মূলধনের নয়, শিল্প-কারখানার ব্যবস্থাপনায়ও অংশ গ্রহণ করবে।

মাঝারি আয়তন শিল্প-কারখানা :

বেসরকারী খাতে মধ্যমায়তন শিল্প-কারখানার উন্নতিব জন্যে সরকার উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় প্রেরণা জোগাবে। অবশ্য এই সব শিল্প-কারখানা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলো কর্তৃক আরোপিত শৃংখলার অধীন থাকবে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটীর-শিল্প :

আমাদের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্পের উন্নয়নের জন্যে সরকার উৎসাহ ও সাহায্য জোগাবে এবং নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহের নিশ্চয়তা

বিধান করবে। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁতীরা ন্যায্যমূল্যে সূতা, প্রচুর পরিমাণে ঋণ ও বাজারের যাবতীয় সুবিধে পাবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার পরিপূরক হবার মতো করে এই সব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-কারখানাকে উন্নত করা হবে। সমবায়ের মাধ্যমে এই সব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-কারখানাকে যতদূর সম্ভব উন্নীত কবা হবে।

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে চাল ও আটার কল, তেল কারখানা, চিনির কল এবং অনুরূপ কৃষিজ পণ্য-শিল্প যতদূর সম্ভব বেশী করে স্থাপন করা ও চালানো হবে। যাতে গ্রামাঞ্চলের দূর প্রান্তসহ দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছড়িয়ে পড়তে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ যাতে শিল্পায়ণের সুযোগ-সুবিধায় শরীক হতে পারে এবং শহরগুলোর ওপর থেকে মানুষের ভিড় ও চাপ কমে যায়, সেইটেই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

কৃষি ও গ্রামের জনগণ :

আমাদের জনগণের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। সে-জন্যে কৃষি ও গ্রামের মানুষের অবস্থা উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া না হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের সমস্ত পরিকল্পনাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। একদিকে আমাদের গোটা সমাজের সর্বত্র দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যদিকে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য রয়েছে। এর পেছনে ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও, নিকট অতীতে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির জন্যে এই বৈষম্য আরও বেড়ে গেছে। ফলে গরীব চাষীর হাত থেকে সম্পদ ধনী পুঁজিপতিদের হাতে ব্যাপকভাবে পাচার হয়ে গেছে। আওয়ামী-লীগ অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে এইরূপ শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার অংগীকার করেছে। আর এটা করতে হলে কৃষিখাতে

সুদূর-প্রসারী বিপ্লবের প্রয়োজন এবং এই ধরণের বিপ্লব সাধনের পূর্ব-শর্ত হলো, ভূমি ব্যবহারের বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন এবং বহুমুখী সমবায়ের মতো নয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

. আমাদের গ্রামাঞ্চলের জনগণের আরও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। সেই সংগে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, অতীতের শোষণের ফলে সৃষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কৃষিকে নোতুন জীবন দিতে হলে সরকারকে প্রভূত পরিমাণে সার ও উন্নত বীজ থেকে শুরু করে নলকূপ, পাওয়ার পাম্প ও কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদির সাহায্য দিতে হবে। আওয়ামী লীগ আমাদের কৃষি-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের অংগীকার করছে।

জায়গীরদারী, জমিদারী ও সরকারী প্রথা বিলোপ এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ ঃ

জমি ব্যবহারিক পদ্ধতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে, তা হলো ঃ—(ক) পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যমান জায়গীরদারী, জমিদাবী ও সরদারী প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ; (খ) জমিব প্রকৃত চাষীদের স্বার্থে ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ; (গ) জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ এবং নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ স্থানীয় জনসাধারণের অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে ; (ঘ) সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের কাছে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

বহুমুখী কৃষি-সমবায় ঃ

কৃষি-বিপ্লবের আরও একটি পূর্ব-শর্ত হলো, কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। জমি খণ্ড-বিখণ্ড ও উপ-বিভক্তির ফলে যে-সব অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করা গেলেই এটা সম্ভব হবে। জমির একত্রীকরণের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। তবে

সমবায়ের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন চাষীর 'প্লট'-গুলিকে 'গ্রুপ' করে তার যৌথ ব্যবহারের ব্যবস্থা দ্বারা আশু সমাধান করা যাবে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠার বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রতিটি থানায় একটা করে মূল উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই রকম সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিয়ে সরকার এই সব সমবায়ে জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করবে। সেচ, জলনিষ্কাশণ, বাঁধ, গভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প, উন্নত ধরনের বীজ, সার, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ঔষধ, ঋণ, আধুনিক কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান প্রভৃতির আকারে এই সাহায্য দেয়া হবে।

ভূমি-রাজস্ব ঃ

আমাদের বর্তমান জনসাধারণের ওপর ভূমি-রাজস্ব একটি বিরাট বোঝা। এর আশু সমাধান হিসেবে পাকিস্তানের সর্বত্র পঁচিশ বিঘে পর্যন্ত জমির খাজনা ও বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হবে। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, বর্তমান ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন।"

শ্রমিক অধিকার ঃ

শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে বলা হলো, "আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার ঘোষণা মোতাবেক শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, যৌথ দর-কষাকষির অধিকার এবং ধর্মঘটের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। শ্রমিকদের এই ধরনের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে প্রণীত সমস্ত আইন বাতিল করা হবে।

সরকার যাতে শ্রমিকদের ন্যায্য স্বার্থ-উন্নয়নে গঠনমূলক ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং সেই সংগে শিল্প—

উৎপাদন উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে মৌলিক সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, সেজন্যে সরকারের শ্রম-সংক্রান্ত সমগ্র প্রশাসন-যন্ত্রের পুনর্বিন্যাস করা হবে।

সরকার শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকদের জন্যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করবে এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধি এবং তাদেব ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে শিক্ষা দেয়া হবে।

শ্রমিকদেব জীবনধারণের উপযোগী মূল বেতন দেয়া হবে এবং চাকুরীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। একই কাজের জন্যে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সবাই যাতে সমান বেতন পায়, তার ব্যবস্থা করা হবে। শ্রমিকদের এবং তাদেব পরিবারবর্গকে অবশ্যই নিম্নলিখিত মৌলিক সুবিধাব নিশ্চয়তা দেওয়া হবেঃ

(১) বিনাভাড়ায় বাসোপযোগী গৃহ।

(২) বিনা খরচায় চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে।

(৩) অসুস্থতার সময়ে পুরো বেতনে ছুটি।

(৪) প্রত্যেক পুরো বছরের জন্যে পুরো বেতনে একমাসের ছুটি।

(৫) অক্ষমতা ও অবসর গ্রহণেব ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধে প্রদান।

(৬) ন্যূনপক্ষে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায় পর্যন্ত বিনা খরচে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা।

(১) মহিলা শ্রমিকদের বেলায় পুরো সুযোগ-সুবিধে সহ মেটারনিটি ছুটি।

উপরোক্ত অধিকার সুনিশ্চয় করা ছাড়াও ন্যায় ও সাম্য-পরায়ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিচালনার সংগে শ্রমিকরা ক্রমেই বেশী করে সংযুক্ত হয়ে উঠবেন।

এই একই সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে শ্রমিকরা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তার মুনাফায় তাঁদের একটা অংশ পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। এতে উৎপাদন বৃদ্ধির অংশ শ্রমিকরাও পাবেন।

সরকারী এবং আধা-সরকারী সংস্থাগুলোয় চাকুরীরত শ্রমিক-দের জীবনধারণের উপযোগী বেতন, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং অসুস্থতা ও অবসরকালীন সুবিধে সহ কল্যাণমূলক সুবিধের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

আশ্রয় মানুষের জীবনের একটি মৌলিক প্রয়োজন। তাই নিম্ন আয়ের লোক এবং পল্লীবাসীদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমিকদের জন্যে মালিকদের দ্বারা বাসস্থানের ব্যবস্থার স্কীম ছাড়াও সরকার বাসস্থান উন্নয়নের জন্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ঃ

(ক) শহরগুলোতে নিম্ন আয়ের লোকদের জন্যে আবাসিক ইউনিট নির্মাণ।

(খ) পল্লী এলাকায় বাসস্থান নির্মাণের জন্যে পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার সদ্ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পল্লী এলাকায় গৃহ-নির্মাণে নয়া মডেল প্রবর্তন।

পররাষ্ট্র নীতি প্রসংগে ঃ

নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে আওয়ামী লীগ তার বৈদেশিক নীতি প্রসংগে যে প্রতিশ্রুতি দিলো, তা' নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী। বৈদেশিক নীতি প্রসংগে বলা হলো, "আমাদের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বের ভিত্তিতেই আমাদের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারিত হবে। এর সংগে আমাদের বহিঃসীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নই নয়, আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের প্রশ্নও জড়িত রয়েছে।

আমাদের জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা একটি স্বাধীন, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির জন্যে অংগীকারাবদ্ধ। স্বীকার করতে হবে যে, এতদিন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতি অনুসৃত হয়েছে, তার সংগে

একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির প্রতিশ্রুতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাবেক নীতির ফলে বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋণ ও দেনার বোঝা বেড়ে গেছে। বিদেশের ওপর এই ধরণের নির্ভরশীলতা, আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আপোষমূলক নীতি গ্রহণে মারাত্মক ভাবে বাধ্য করে। ফলে জাতীয় স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে নয়া কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এই পরস্পর-বিরোধী নীতির অবসান ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। এর ফলেই আমরা সত্যিকার ভাবে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণে সক্ষম হবো।"

"সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়—এই নীতির অনুসরণে ন্যায় এবং পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আমাদের প্রতিবেশীদেব সহ সকল দেশের সংগে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানে আগ্রহী।......"

"শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লক্ষ্য অনুযায়ী আমরা সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায়সংগত মীমাংসার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবো।"

"সিয়াটো, সেন্টো এবং অন্যান্য সামরিক চুক্তিতে চিরআবদ্ধ হয়ে থাকাকে আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিশ্বাস করি এবং এই কারণেই আমরা সিয়াটো, সেন্টো এবং অন্যান্য সামরিক চুক্তি থেকে অবিলম্বে পাকিস্তানের বেরিয়ে আসার পক্ষপাতী।"

"আমরা সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণ-বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছি।"

আজ আমেরিকা সরকার কেন বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জোগায় না, এর কারণ নিহিত রয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে (ঘোষণা-পত্রে)। আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুত

বৈদেশিক নীতি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে, ইয়াহিয়া সরকার মার্কিন তাঁবেদার। আর তারই জন্যে মার্কিন সরকার ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের দরদী সেজেছে; তার সামরিক রসদের জোগান দিচ্ছে বাংলা দেশের মুক্তিকামী মানুষদের হত্যা করার জন্যে।

শুধু বৈদেশিক নীতি নয়, সামগ্রিক ভাবে নির্বাচনী ঘোষণা-পত্রে বাংলা দেশের সকল স্তরের মানুষের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন রয়েছে এবং তারই জন্যে বাংলা দেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষ আর সব দলের নির্বাচনী ঘোষণা-পত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনকি মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম দলের ইসলামের দোহাই ও বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে পারেনি। ৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচন সারা পৃথিবীতে নির্বাচনের ইতিহাসে এক নজীরবিহীন অধ্যায় হয়ে রয়েছে। জাতীয় পরিষদের আসনের মধ্যে বাংলা দেশের মোট ১৬২-টি আসনে নির্বাচন। তার মধ্যে ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত এলাকার মোট ৯-টি আসনের নির্বাচন স্থগিত রইলো। ১৫৩-টি আসনেব মধ্যে ১৫১-টি আসন পেলো আওয়ামী লীগ। বাকী দুটি আসনের একটি পেলেন নূরুল আমীন, অপরটি পেলেন রাজা ত্রিদিব রায়। নির্বাচিত হবার পর রাজা ত্রিদিব রায় বিবৃতি দিলেন, —৬-দফা ১১-দফা ভিত্তিক সংবিধান রচনায় তিনি শেখ মুজিবকে সমর্থন করবেন।

কিছুদিন পর ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকার ৯-টি আসনেও নির্বাচন হলো। ৯-টি আসনই পেলো আওয়ামী লীগ। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৩-টি; তার মধ্যে পূর্ব-বংগের ৭-টি আসনই পেলেন শেখ মুজিব। ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে মোট ৩১৩-টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করলো ১৬৭টি আসন। নির্দলীয় রাজা ত্রিদিব রায় আওয়ামী লীগ সমর্থক। তাঁকে নিয়ে সংখ্যা দাঁড়ালো ১৬৮-টিতে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের একক

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং তার অবিসম্বাদিত নেতা মহানায়ক বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে ভুট্টোর পিপল্স্ পার্টি।

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী।

ঢাকা রেস-কোর্সের বিশাল ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে বাংলা দেশের অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিষদ সদস্যদের নিয়ে শপথ গ্রহণ করলেন। ঘোষণা করলেন, তিনি বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তি আনবেন। সেদিন বাংলা দেশের ঢাকা নগরীতে জয়োৎসব। হাজার হাজার শান্তি পারাবত ছাড়া হলো আকাশে। তোপধ্বনি, হাউই, আতস-বাজীতে ঢাকা শহর মুখরিত। মুক্তি আসছে। নিপীড়িত জনতার তাই এই উদ্দাম উল্লাস।

আওয়ামী লীগের এই ঐতিহাসিক বিজয়- পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণীকে এক অচিন্ত্যপূর্ব অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিলো। সুতরাং চললো আবার ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো। জানুয়ারীর মধ্য ভাগে ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন শেখ মুজিবের সংগে আলোচনা করতে। আওয়ামী লীগের তরফ থেকে ৬-দফার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হলো। ইয়াহিয়া খান যদিও সংবিধান সম্পর্কে তার মতামত দিলেন না, তথাপি এমন ভাব দেখালেন যে, ৬-দফাতে আপত্তিকর কিছুই নেই, তবে পিপল্স্ পার্টির নেতা ভুট্টোর সংগে একটা মতৈক্যে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সুতরাং, দ্বিতীয় পর্যায়ে বৈঠক শুরু হলো পিপল্স্ পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে ঢাকা শহরে ১৯৭১ সালের ২৭শে জানুয়ারী থেকে। অনেক তোড়জোড় করে বিরাট দল নিয়ে এলেন ইসলামিক সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী ভুট্টো। আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে অনেকগুলো বৈঠকে মিলিত হলেন তাঁরা; আলোচনা করলেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার মতো ভুট্টোও তাঁর সংগে সংবিধান সম্পর্কে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

নিয়ে আসেন নি। শুধু তাঁরা ৬-দফার তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যাই শুনতে ব্যস্ত রইলেন। ফলে আলোচনা হলো যথেষ্ট, কিন্তু সংবিধান সম্পর্কে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলো না। ভুট্টো ফিরে গেলেন। ফিরে যাবার সময়ে জানিয়ে গেলেন, আলোচনার দ্বার খোলাই রইলো, প্রয়োজন হলে আরও আলোচনা করা যাবে। আওয়ামী লীগ নেতা ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্যে অনুরোধ জানালেন ইয়াহিয়া খানকে। কিন্তু ভুট্টো অনুরোধ করলেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বানের জন্যে। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া ভুট্টোর পরামর্শে ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দাবী প্রথমবারের মতো উপেক্ষিত হলো।

ভুট্টোর উপদেশ মতো ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর আদুরে দুলাল ভুট্টো পরিকল্পনা মতো বেঁকে বসলেন। ভুট্টো জানালেন, তাঁর দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কট করবে। শুধু তাই নয়, পরিষদ বয়কট ঘোষণা করার পরপরই ভুট্টো প্রকাশ্যে অন্যান্য সমস্ত দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভীতি-প্রদর্শন অভিযান শুরু করলেন। এমন কি, অধিবেশনে যোগদানেচ্ছু সদস্যদের হত্যার হুমকী দিলেন। ভুট্টো সাহেবের গণতন্ত্রের অপূর্ব মহিমা! পরিষদ সদস্যদের ভীতি-প্রদর্শন কার্যে ভুট্টোর সংগে প্রকাশ্যে হাত মেলালেন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান, ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর, লেঃ জেনারেল ওমর। কিন্তু ভুট্টো এবং লেঃ জেনারেল ওমরের প্রবল চাপ সত্ত্বেও পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি এবং সর্বজন-ধিকৃত কাইয়ুম লীগের সদস্যগণ ব্যতিরেকে অপরাপর দলের সমস্ত সদস্যই ৩রা মার্চের জাতীয় অধিবেশনে যোগদানে জন্যে বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার উপক্রম দেখে

১লা মার্চ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জাতীয় পরিষদেব অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করলেন। সংগে সংগে বাংলাদেশে নিযুক্ত গভর্নর এডমিরাল আহসানকেও বরখাস্ত করলেন। তাঁর অপরাধ, তিনি মধ্যপন্থী। বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতাকে দংশন করবার জন্যে শোষকশ্রেণীব 'বুলডগ' চাই। সুতরাং টিক্কা খানকে গভর্নর নিযুক্ত করা হলো।

ইয়াহিয়াব ঘোষণা শুনে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ ক্রোধে ফেটে পড়লো। সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ইয়াহিয়ার ক্ষমতা-হস্তান্তরেব কোন প্রকার সদিচ্ছা নেই। ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা থাকতে বাংলা দেশেব অর্থনৈতিক মুক্তিব কোন আশা নেই। সুতরাং চূর্ণ করো এই শৃংখল, ভাংগো কারার লৌহকপাট। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের জনতা রাস্তায় নেমে পড়লো। বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে, গ্রামে, বন্দরে মিছিলের উত্তাল তরংগ। সমুদ্র তরংগের ন্যায় মিছিলের পর মিছিল আসতে লাগলো শেখ মুজিবের বাড়ীতে। 'কোন কথা নয়, শিকল ছিঁড়ে ফেলো। স্বাধীনতা ঘোষণা করো।'

কিন্তু বাংলাদেশের মহানায়ক অতিমাত্রায় ধীর। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। আজ নিজের হাতে পাকিস্তানকে খণ্ডিত করতে দ্বিধা আসছে। তাছাড়া তাঁর দলীয় কর্মসূচী বাংলার স্বাধিকার—স্বাধীনতা নয়, সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতা নয়। একসাথে চলবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। তিনি ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা বাংলা দেশে সাধারণ হরতাল ঘোষণা করলেন। তাঁর সংগ্রামের ধারা হিসেবে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ধারাই বেছে নিলেন।

১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ বাংলা দেশের হরতালের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। একদিকে মহানায়ক কর্তৃক হরতালের ডাক, অন্যদিকে সামরিক শাসকচক্রের হুঁশিয়ারী। সামরিক শাসনের শাসনদণ্ডকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে হরতাল পালিত হলো। ছেলে-মেয়েরা স্কুল-

কলেজ-বিত্থালয়ে গেলো না, অফিস আদালতে না গিয়ে সমস্ত সরকারী কর্মচারী বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিলো, রেলগাড়ীগুলো স্টেশন থেকে এক পাও নড়লো না, এমন কি বিমান চলাচলও বন্ধ রইলো। শক্তি পবীক্ষা হয়ে গেলো। বাংলাদেশের মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সামরিক শাসন। বাংলাদেশের প্রকৃত শাসক বাংলার মহানায়ক বংগবন্ধু শেখ মুজিবুব রহমান।

২রা মার্চ থেকে অবিরাম অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব নতুন নির্দেশ দেবেন এই ঘোষণা করা হলো। ২রা ও ৩রা মার্চে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে বাংলার মানুষকে হটিয়ে দেয়া গেলো না। সুতরাং সময় চাই। ঢাকার প্রেসিডেণ্ট ভবনে ১০ই মার্চে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব জানালেন ইয়াহিয়া খান। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন ২৫শে মার্চে। গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন শেখ মুজিব। বাংলাব মাটিতে রক্ত-ঝরানোর জন্যে দায়ী ভুট্টো কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে গোলটেবিলে বসতে তিনি রাজী নন। শহীদের তাজা রক্ত পায়ে মাড়িয়ে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করলেন।

৭ই মার্চ।

রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভা। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ। সারা বিশ্ব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাংলা দেশের জাতীয় জীবনের নিয়ন্ত্রক একটি ঘোষণার। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে বাংলা দেশের মহানায়ক বংগবন্ধু বক্তৃতা মঞ্চে এলেন; আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বললেন: "আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাইনে, আমরা মানুষের অধিকার চাই। শহীদের তাজা রক্তের ওপর পা দিয়ে আমি এসেম্‌ব্লিতে যেতে চাইনে।" তারপর বাংলার মহানায়ক নির্দেশ দিলেন, "আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারী-অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ থাকবে।

গরীব যাতে কষ্ট না পায়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না পায়, সেজন্যে রিক্সা, ঠেলাগাড়ী চলবে। টেলিগ্রাফ টেলিফোন চলবে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট, জজকোর্ট, সরকারী ও আধা-সরকারী সব প্রতিষ্ঠান চলবে না।" স্বৈরাচারী সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, "আর যদি একটি গুলী চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়—তবে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা-কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, আমরা ওদের ভাতে মারবো, আমরা ওদের পানিতে মারবো। সৈন্যদের বলি, তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। তোমাদেব কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আমাদের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা হলে ফল ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা মরতে শিখেছি, কেউ আমাদের রুখতে পারবে না। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, কিন্তু মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

ইয়াহিয়া খানকে জানালেন যে, তাঁর চারটি শর্ত যদি মেনে নেয়া হয়, তবে তিনি গণ-পরিষদে যাবেন কিনা ভেবে দেখবেন—

প্রথম শর্ত—অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত—সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।

তৃতীয় শর্ত—গণহত্যার তদন্ত করতে হবে।

চতুর্থ শর্ত—নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৯ই মার্চ, ঢাকার জনসমুদ্রে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের সংগ্রামকে সমর্থন জানালেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, "শেখ মুজিব আমার পুত্রের চেয়ে অধিক প্রিয়।" বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে দুই মহানায়কের মিলন হলো। এক মহানায়ক হলেন আর এক মহানায়কের সম্পূরক।

রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়লো সারা বাংলাদেশ। ৩রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ যে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের এ পর্যায়ে বাংলার মানুষ সেদিন পাক সরকারের সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিলো। এমনকি গভর্নর হিসেবে ইয়াহিয়া নিযুক্ত লেঃ জেনারেল টিক্কা খানেব শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্যে পাওয়া গেলো না হাইকোর্টের কোন বিচারপতি। পুলিশ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সহ প্রশাসন বিভাগের কর্মচারীরাও কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন, সামরিক শাসক টিক্কা খানের হুমকি দেয়া সত্ত্বেও। সামবিক দপ্তবের বেসামরিক কর্মচারিগণও শেখ মুজিবেব নির্দেশ মেনে অফিস বর্জন করলেন। শুধুমাত্র অফিস বর্জন নয়, বেসামরিক প্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। তাঁরা স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা বংগবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ ব্যতিরেকে আর কারও নির্দেশ মানতে রাজী নন। সারা বাংলা দেশে সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও মুজিবুর রহমানই ছিলেন প্রকৃত রাষ্ট্রপতি। আর বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলো আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশে আইনানুগ কোন কর্তৃপক্ষ না-থাকা সত্ত্বেও আপামর জনসাধারণের সহযোগিতায় সেদিন আইন-শৃংখলা রক্ষায় যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছিলো, তা শুধু সম্ভব হয়ে থাকে স্বাধীনতার অমৃত পানে তৃপ্ত ও দীপ্ত নব-উত্থিত জাতির মধ্যেই।

চার দফা প্রস্তাব পেশ করার মাধ্যমে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন সংকটের রাজনৈতিক সমাধান। তিনি চেয়েছিলেন শান্তিপুর্ণ সমাধানে পৌঁছুতে ইয়াহিয়াকে শেষ সুযোগ দিতে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী, তাদের তাঁবেদার ইয়াহিয়া ও তার জেনারেলরা শেখ মুজিবের সদিচ্ছার মূল্য দিতে অস্বীকার করলো। বাংলার অবাধ

লুণ্ঠনের অধিকার তারা ছাড়তে রাজী নয়। ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিলো তারা। গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি তাদের ষড়যন্ত্রের ধাপ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তাদের লক্ষ্য ছিলো, বাংলা দেশে তাদের সামরিক শক্তি জোরদার করার জন্যে কালক্ষেপ করা। ইয়াহিয়ার গোলটেবিল বৈঠক প্রস্তাব, তাঁর ঢাকা সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালানোর জন্যে প্রস্তুতি-গ্রহণ। সংকট নিরসনের উদ্দেশ্য তাদের ছিলো না। বর্তমানে এটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের পরিকল্পনা বেশ আগে থেকেই নেয়া হয়েছিলো। উদাহরণ স্বরূপ :

১লা মার্চের সামান্য কিছু আগে রংপুর থেকে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ট্যাংকগুলো ঢাকায় ফেরত আনা হয়। ঐ সময় থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী কোটিপতি ব্যবসায়ীদের পরিবার এবং সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবার-পরিজনকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে।

১লা মার্চের পর থেকে বাংলা দেশের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় এবং ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। সিংহলের পথে পি. আই. এ. কমার্শিয়াল ফ্লাইটে সাদা পোশাকে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের বাংলা দেশে আনা হলো। সি-১৩০ পরিবহণ বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র এবং রসদ এনে বাংলা দেশে স্তূপীকৃত করা হলো।

"হিসেব নিয়ে জানা গেছে, ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সহ অতিরিক্ত এক ডিভিসন সৈন্য বাংলা দেশে আমদানী করা হয়। ব্যাপারটা নিরাপদ করার জন্যে ঢাকা বিমান বন্দরকে বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। সমগ্র বিমান বন্দর এলাকায় মেসিনগান ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করা হয়। যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটন-

ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটা এস. জি. কমাণ্ডো গ্রুপ বাংলা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এদের উদ্দেশ্য ছিলো, বাংগালী ও অবাংগালীর মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা উত্তেজনার পরিবেশ তৈরী করা। প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের এই strategy গোপন করার অংশ হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে তার আলোচনায় পরম সাধু সেজেছিলেন। ১৫ই মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমনামা জারী হলো, সরকারী কর্মচারীরা কাজে যোগদান না করলে তাদের শুধু বরখাস্তই করা হবে না, সামরিক আদালতে তাদের বিচার করা হবে।

ঐ তারিখেই পাল্‌টা জবাব দিলেন শেখ মুজিব। জারী করলেন তাঁর পঁয়ত্রিশ দফা নির্দেশনামা বাংলা দেশের উদ্দেশ্যে, যে ঘোষণা বাংলা দেশের শাসনভার গ্রহণের নামান্তর মাত্র। শেখ মুজিব বাংলা দেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের কল্যাণে দেশের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করলেন।

জনতার রায়ে অপদস্থ ইয়াহিয়া খানকে আলোচনায় বসতে হলো। ১৬ই মার্চ আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা কালে ইয়াহিয়া ১৬ই মার্চের পূর্বে যা ঘটেছে, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে ছল-করা আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার এ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তর-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক চার দফা শর্তের প্রতি সামরিক জান্তার মনোভাব কী? জবাবে ইয়াহিয়া জানালেন যে, এ ব্যাপারে তাঁদের তেমন কোন আপত্তি নেই। ইয়াহিয়া আরও বলেন যে, চার দফা শর্ত পূরণ ভিত্তিতে উভয়পক্ষের উপদেষ্টাগণ একটা অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

কয়েক দফা আলোচনা হলো। আলোচনা কালে চারটি মৌলিক বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলো:

(১) **Martial Law** বা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে

প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণার মাধ্যমে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

(২) প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

(৩) ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।

(৪) জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হবেন। তারপর শাসনতন্ত্র চূড়ান্ত করণের উদ্দেশ্যে এক যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হবেন।

আজ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জাতীয় পরিষদের পৃথক পৃথক অধিবেশনের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে এবং অসত্য তথ্য পরিবেশন করে পাকিস্তানকে খণ্ডিত করবার প্রয়াসের মিথ্যে অপবাদটি শেখ মুজিবের স্কন্ধে চাপাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে, পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাব ছিলো ক্ষমতালিপ্সু ভুট্টোর এবং ভুট্টোর মনোরঞ্জনের জন্যে ইয়াহিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই প্রস্তাবের সুবিধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া খান সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, ছয়দফা হলো বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে নির্ভরযোগ্য এক নীল নকশা। পক্ষান্তরে, এটার প্রয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে সৃষ্টি করবে নানা অসুবিধে। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানী এম. এন. এ-দের পৃথকভাবে বসে ছয় দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলোপের আলোকে একটা নোতুন ধরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যে এই নীতিগত মতৈক্যের পর একটিমাত্র প্রশ্ন থেকে যায় এবং তা হলো পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও বাংলা দেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন। এক্ষেত্রেও উভয়পক্ষ এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ছয় দফার ভিত্তিতে অদূর

ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হতে যাচ্ছে, মোটমুটিভাবে তার আলোকেই কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হবে।

অন্তবর্তীকালীন মীমাংসাব এই অংশটি সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম. এম. আহমদকে বিশেষ বিমানে ঢাকা আনা হয়। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সংগে আলাপ আলোচনায় তিনি স্পষ্টভাবে একথা বলেন যে, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ৬-দফা কার্যকরী করার প্রশ্নে দুর্লঙ্ঘ্য কোন সমস্যা দেখা দেবে না। এমনকি অন্তবর্তী পর্যায়েও না।

আওয়ামী লীগের খসড়াব ওপর তিনি যে তিনটি সংশোধনী পেশ কবেছিলেন, তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছিলো যে, সবকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন যে ব্যবধানটুকু ছিলো, তা নীতিগত নয়, বরং কোথায় কোন্ শব্দ বসবে তা নিয়ে। ২৪শে মার্চের বৈঠকে ভাষার সামান্য রদবদল সহ সংশোধনীগুলো আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। অতঃপর অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শেষদফা বৈঠকে মিলিত হবার পথে কোন বাধাই ছিলো না।

কোন পর্যায়েই আলোচনা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়নি। অথবা ইয়াহিয়া বা তাঁর উপদেষ্টাবা আভাষে-ইংগিতেও এমন কোন কথা বলেননি যে, তাঁদের এমন একটা বক্তব্য আছে যা থেকে তাঁরা কোন প্রকার সরে আসতে পারেন না।

সর্বাত্মক গণহত্যাকে ধামা চাপা দেবার জন্যে ইয়াহিয়া ক্ষমতা-হস্তান্তরে আইনগত অনুমোদনের প্রশ্নেও আজ জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। আলোচনায় ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর দলবল একমত হয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা-হস্তান্তর করা হয়েছিলো, তিনিও সেভাবে একটা ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু জাতীয়

পরিষদের অধিবেশন ব্যতিরেকে ক্ষমতা-হস্তান্তরকরণ সম্ভব ছিলো না—আজ এই মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে বেড়াচ্ছে ইয়াহিয়া-ভুট্টো-চক্র। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, এমন কোন কথা ঘুণাক্ষরেও ইয়াহিয়া-ভুট্টো-চক্র উত্থাপন করেনি। এবং মাত্র এই কারণে আলোচনা ব্যর্থ হবার কোন কারণও ঘটেনি। ভুট্টো-ইয়াহিয়ার কৈফিয়ত যে নির্জলা মিথ্যে, তা এই কথা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ছিলো একক-সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে তাঁদের কোন ভয় ছিলো না। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের একক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও ছিলো না। শুধু তাই নয়, পৃথক পৃথক বৈঠকের প্রস্তাবে শেখ মুজিব যে সম্মতি দিয়েছিলেন, তা শুধু সংকটের সমাধানের জন্যেই সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে, অন্য কোন কারণে নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের সদিচ্ছার, সংকট সমাধানে তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহের কোন মূল্যই দেয়নি সামরিক নায়ক ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর পোষ্যপুত্র ভুট্টো।

২৩শে মার্চ, ছাত্রলীগের চার নেতা, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহ-জাহান সিরাজ, আ. সা. ম. রব এবং আব্দুল কুদ্দুছ মাখনের নির্দেশে বাংলার ঘরে ঘরে বাংলা দেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো। বাংলার মানুষ তার অন্তরের সবটুকু ঐশ্বর্য দিয়ে সে পতাকাকে সালাম জানালো। বাংলার মাঠে মাঠে, প্রতি ঘরে গীত হলো—

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

২৪শে মার্চ, জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকে, জনাব এম. এম. আহমদ তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এই খসড়া প্রস্তাব আলোচনা ও তার ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে জেনারেল পীরজাদার

আহ্বানে একটা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো। কিন্তু সে চূড়ান্ত বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হলো না। কারণ বৈঠক অনুষ্ঠানের আর প্রয়োজন ছিলো না। তখন ঢাকায় পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং বেসামরিক পোশাকে সামরিক ব্যক্তিদের আমদানী হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি এবং সামরিক নায়কদের উপদেশে বৈঠক চেয়েছিলেন কালক্ষেপণের জন্যে। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। সুতরাং আর বৈঠক নয়, আলোচনা নয়, অস্ত্রের নির্মমতম ব্যবহার করতে হবে। গণতন্ত্র, ইসলাম, জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় পবিত্রতাব ধ্বজাধারীরা মুখোসের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করলো তাদের রক্তপিপাসু দানবীয় মূর্তি নিয়ে। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা এম এম. আহমদ আওয়ামী লীগকে কোন কিছু না জানিয়ে করাচী ফিরে গেলো। ফিরে গেলেন ষড়যন্ত্রের নায়কেরা—ইয়াহিয়া, ভুট্টো, দৌলতানা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

২৫শে মার্চ।

ষড়যন্ত্রের কর্মসূচী রূপায়িত করতে এগিয়ে এলো পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী। একপাল হিংস্র নেকড়ের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো, ঢাকা, কুষ্টিয়া, খুলনা, চট্টগ্রামে—ঘুমন্ত মানুষের ওপর। বাংলাদেশের মানুষ শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হলো। বাংলা দেশ পাকিস্তান দ্বারা আক্রান্ত। বিলুপ্ত পাকিস্তানের অখণ্ডতা। বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের অংশ নয়; কেননা, বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতো, তবে এই সশস্ত্র হামলার পূর্বে পাকিস্তানের সামরিক সরকার নিশ্চয়ই সান্ধ্য আইন জারী করতো (যদিও তার কোন কারণ বিদ্যমান ছিলো না); নিরীহ লোকেদের সাবধান করে দিতো। কিন্তু জনসাধারণকে কোন প্রকার সতর্ক না করে মেশিনগান, মর্টার, ট্যাঙ্ক নিয়ে তারা আক্রমণ চালালো; আক্রমণ চালালো রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকে, পীলখানা ই. পি.

আর ক্যাম্পের ওপর; আক্রমণ চালালো, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ছাত্রাবাসের ওপর—ঘুমন্ত মানুষের ওপর। কোন ঘোষণা ব্যতিরেকে তারা যুদ্ধ আরম্ভ করলো বাংলা দেশের বিরুদ্ধে। কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে দিতে লাগলো বাড়ী-ঘরগুলো, ছাত্রাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়, কল-কারখানা; মেসিনগানের গুলীতে নির্বিচারে হত্যা করলো নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু—সবাইকে। কামানেব শব্দে সদ্য ঘুম-ভাংগা মানুষ যারা রাস্তায় বেরিয়ে এলো, তারা আর ঘরে ফিরে যেতে পারলো না। শুধু তাই নয়, দোরের কপাট ভেংগে, বলপূর্বক ঘরে ঢুকে, তারা চালালো নারকীয় হত্যাকাণ্ড। মায়ের সম্মুখে, পিতার সম্মুখে মেয়েকে, ভায়ের সম্মুখে বোনকে, স্বামীর চোখের সম্মুখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করলো। বুদ্ধিজীবী শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, কৃষক কেউ রেহাই পেলো না এই নরঘাতক নরপশুদেব হাত থেকে।

একটি রাতে লক্ষাধিক লোক প্রাণ দিলো; সহস্র সহস্র বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেলো; অগণিত নারী ধর্ষিতা হলো। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে নিপীড়নের কৃষ্ণতম অধ্যায় সংযোজন করলো হানাদার ইয়াহিয়া সরকার।

মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান এবং তাঁদের সামরিক চক্র তাঁদের কৃত অপরাধের কৈফিয়ত দিচ্ছেন এই বলে যে, বাংগালীরা অবাংগালীদের নির্বিচারে হত্যা করবার জন্যেই তাঁরা নাকি এই মৃদু সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন! এর চাইতে নির্লজ্জ মিথ্যে কৈফিয়ত আর কী হতে পারে? পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ওয়ালী খান, দৌলতানা, মুফতি মাহ্‌মুদ—যাঁরা ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনায় অংশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসেছিলেন, তাঁরা ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকাতেই ছিলেন। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত স্বয়ং ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টো ঢাকাতে উপস্থিত। এঁদের প্রত্যেকেই ঢাকা থেকে করাচীতে ফিরে গিয়ে

প্রেস কনফারেন্স করে অথবা বেতার যোগে বৈঠকের ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ ক'রে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা কিংবা বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই সত্যবাদী (?) ভদ্দরলোকদের প্রথম বিবৃতিতে বাংলাদেশের মানুষ, আওয়ামী লীগ এবং বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদগারই ছিলো, তাঁদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ছিলো, পাকিস্তানকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিলো; কিন্তু বাংগালীরা নিরস্ত্র অবাংগালীদের নির্বিচারে হত্যা করবার জন্যে আলোচনা বৈঠক ভেংগে গেছে এবং তারই জন্যে ইয়াহিয়া সরকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, এমন ধরণের কোন প্রকার ইংগিত পর্যন্ত কারো বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়নি। ইয়াহিয়া খান এবং টিক্কা খান তাঁদের জঘন্যতম কার্যের যৌক্তিকতা দেখিয়ে ২৬শে মার্চ তারিখে বেতার বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও বাংগালী কর্তৃক অবাংগালী নিধনের বিন্দুমাত্র অভিযোগ ছিলো না। এই সব তথাকথিত সত্যবাদীদের উপস্থিতিতে যদি তাঁদের নাকের ডগার ওপর অবাংগালী-নিধন কাজের ন্যায় নিষ্ঠুর কাজটি অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে বাংলাদেশের মাটিতে বসেই তাঁরা তার প্রতিবাদ করতে পারতেন, কিংবা বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় তাঁরা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, অন্ততঃপক্ষে তাতে তার উল্লেখ করতে পারতেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা বৈঠক চলাকালে বাংলা দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্ততঃ পঞ্চাশজন খ্যাতনামা বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বাংগালী কর্তৃক অবাংগালী নিধন কার্য অনুষ্ঠিত হলে তা কিছুতেই তাঁদের দৃষ্টি এড়াতো না। তাঁদের প্রদত্ত রিপোর্টে স্থান পেতোই। কিন্তু তাঁদের কোনো রিপোর্টে এধরণের কোন বিবরণ প্রকাশিত হয়নি।

তৃতীয়তঃ, এ সম্পর্কে ২২শে মার্চ তারিখের সরকারী প্রেস

নোট উল্লেখযোগ্য। ২২শে মার্চের এক প্রেস-নোটে গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে বলা হয় যে, বাংগালী-অবাংগালী দাংগায় রংপুরে ১৭ জন এবং চট্টগ্রামে ৪০ জন নিহত হয়েছে। কিন্তু সরকারের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থা আয়ত্তাধীনে। নিহতদের মধ্যে বাংগালী এবং অবাংগালী উভয়েই ছিলো। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, রংপুর এবং চট্টগ্রাম উভয় স্থানেই অবাংগালীরা বাংগালীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দাংগার সূত্রপাত করে। এ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ তরফ থেকে বংগবন্ধু শেখ মুজিব স্পষ্ট বলেন যে, আলোচনা বৈঠক বানচাল করবার উদ্দেশ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক সরকারের এক অংশের উস্কানীতে এই দুইটি ঘটনা ঘটে। ঐ সময়ে ঢাকাতে কোন দাংগা বা নরহত্যা হয়নি। অবশ্য একশ্রেণীর দুষ্কৃতকারী (যারা মুসলিম লীগের পেশাদার গুণ্ডা শ্রেণীভুক্ত ছিলো) ঢাকাতে কিছু দোকানপাট লুঠ করবার চেষ্টা করলে, আওয়ামী লীগ ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনী কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করে অবাংগালীদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করেন এবং এ ধরণের দুষ্কৃতকারীদের বংগবন্ধু শেখ মুজিব প্রকাশ্যে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের দুশ্‌মন বলে আখ্যায়িত করেন। এর পরও কী একথা বলা চলে যে, অবাংগালীদের নির্বিচারে হত্যা করবার জন্যে ইয়াহিয়া-টিক্কার সামরিক গোষ্ঠী লক্ষ লক্ষ বাংগালীকে হত্যা করেছে? পক্ষান্তরে ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনা কালে, জয়দেবপুর, চট্টগ্রাম, রংপুর ইত্যাদি স্থানে দুর্বৃত্ত পাক-সেনা নিরীহ বাংগালীদের হত্যা করলে বংগবন্ধু শেখ মুজিব আলোচনা বৈঠকে তৎপ্রতি ইয়াহিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইয়াহিয়া খান তার বিহিত ব্যবস্থা করবেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দেবেন—এই মর্মে আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

এ প্রসংগে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের প্রাথমিক শর্ত স্বরূপ শেখ মুজিব যে চারটি শর্ত দিয়ে-

ছিলেন তার ৩নং শর্ত হলো, “গণহত্যার তদন্ত করতে হবে।” বাংগালীরা যদি নির্বিচারে অবাংগালীদের হত্যা করতো, তাহলে শেখ মুজিব কখনও এ শর্ত দিতে পারতেন না।

বাংগালী কর্তৃক অবাংগালী নিধনের মিথ্যে কাহিনীটি প্রথম আবিষ্কৃত হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের চতুর্থ সপ্তাহে অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি এবং এর প্রথম আবিষ্কর্তা ইয়াহিয়ার গবর্নর নরঘাতক টিক্কা খান। ইয়াহিয়া খান এই মিথ্যে প্রচারণাকার্যে টিক্কা খানকে অনুসরণ করেন জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের দানবীয় কার্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্যেই এই মিথ্যে কাহিনীর আবিষ্কার হলো ইসলামবাদের সামরিক শাসকদের মিথ্যেকথার ম্যানুফ্যাকচারিং লেবরেটরীতে।

অবশ্য এই কথা সত্য, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে একদল আবংগালী মুসলমান হানাদাব দস্যুদের সংগে হাত মিলিয়েছে এবং মুক্তি-যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। মুক্তি-যোদ্ধাদের সংগে সংঘর্ষে এদের কারো কারো মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু তারজন্যে মুক্তি-যোদ্ধাদের বিন্দুমাত্র দায়ী করা চলে না। অবাংগালী হোক, আর বাংগালী হোক, যারা দেশের স্বাধীনতার শত্রু এবং দুর্বৃত্ত পাক-সেনাদের অনুচর, তারা সব সময়ে হত্যার যোগ্য। কোনো দেশেই স্বাধীনতার যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক, কিংবা শত্রুর অনুচরদের ক্ষমা করা হয় না। কারণ শত্রুর প্রতি অহেতুক নরম মনোভাব দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা একজন দেশ-প্রেমিক অবাংগালীকে হত্যা করেছেন, এমন একটি নজীর কেউ দেখাতে পারবেন না।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো, মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম আজ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্যে একশ্রেণীর অবাংগালীদের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে বাংগালীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। তার ফলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাংগালী যদি এই সব অবাংগালীদের

বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় রোষে ফেটে পড়ে, তবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার এবং তাঁর সহযোগী ভুট্টো, কাইয়ুম, দৌলতানা, মওদুদী—এদের। কিন্তু কোন অশুভ ষড়যন্ত্রই পরিণামে জয়ী হয় না। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্যে অতীতে হিন্দু-মুসলমান দাংগা বাধিয়েছিলো, সুস্থ চেতনার অধিকারী বাংলার মানুষ সে দাংগাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেছে। আজও সুস্থ চেতনার অধিকারী অবাংগালী, শোষকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে, বাংলার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে, একাত্ম হয়ে যাবে সাড়ে সাত কোটি বাংগালীর সংগে, তাদের অস্ত্রকে উত্তোলিত করবে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার দস্যু সবকারের বিরুদ্ধে এই আশা করা যেমন অন্যায় নয়, তেমন অলীকও নয়। ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় এবং ইতিমধ্যে বাংলাদেশে সে প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশে অবাধ গণহত্যার সমর্থনে আর একটি কৈফিয়ত দিয়েছেন স্বয়ং ইয়াহিয়া খান। বংগবন্ধু শেখ মুজিব নাকি তাঁকে ঢাকায় বন্দী করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ ধরণের হাস্যাস্পদ কৈফিয়ত দিয়ে ইয়াহিয়া খান স্বয়ং নিজেকে সারা বিশ্বে উপহাসেরই পাত্র করে তুলেছেন। সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত পাক-সেনার নিরাপদ বেষ্টনীতে আশ্রয়গ্রহণকারী ইয়াহিয়া খানকে নিরস্ত্র বংগবন্ধু শেখ মুজিব বন্দী করতে চেয়েছিলেন, এ ধরণের বক্তব্য একমাত্র বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিই উপস্থাপন করতে পারে এবং বিশ্বাস করতে পারে।

ইয়াহিয়া, মওদুদী, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর তাবৎ অনুচরেরা বলেন, পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র। ইসলাম আর ইসলামিক রাষ্ট্র রক্ষার্থে এই অভিযান (যদিও এঁদের জীবনে ইসলামীয় আদর্শের ছায়াপাত মাত্র নেই)। শোষণ এবং লুণ্ঠনকে

অব্যাহত রাখার ব্যবস্থাই কী ইসলাম? মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দাসত্বে শৃঙ্খলিত করে রাখার অর্থই কী ইসলাম? ইসলামের কোন্ ধর্মীয় গ্রন্থে দেয়া আছে, নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করার বিধান? পবিত্র কোরাণ-হাদীসের কোন্ পৃষ্ঠায় নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার অধিকার দেয়া আছে? নারীদের পশুর মত দল বেঁধে বলাৎকার করা কোন্ ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধানে? বলাৎকার শেষে নারীর স্তন কেটে, গোপন অংগে সংগীন ঢুকিয়ে হত্যার মহান নির্দেশ কোন্ পয়গম্বর দিয়েছেন? পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থের বিশ্বস্ত পাহারাদার ইয়াহিয়া এবং তাঁর সামরিক-চক্র তাঁদের জানোয়ার সৈন্যদের দিয়ে ইসলামের নামে পাকিস্তান রক্ষার দাবীদার সেজে বাংলাদেশে চালিয়ে যাচ্ছে ঘৃণ্যতম, বর্বরতম নারকীয় অত্যাচার। ইয়াহিয়া, ভুট্টো, মওদুদী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণীর কল্যাণে আজ ইসলামের পবিত্র নাম কলংকিত, মানবতা ধর্ষিত, ধর্ষিত হাজার হাজার বছরে গড়ে-ওঠা মানব-সভ্যতা।

হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিলো বাংলার মানুষ। বিচলিত হয়ে পড়েছিলো তারা। কারণ মহানায়ক শেখ মুজিব শত্রুহস্তে বন্দী। তিনি জানতেন হানাদার সৈন্য একপাল হায়নার ন্যায় ছুটে আসছে। হয়তো তাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু মহানায়ক ধীর, প্রশান্ত, স্থির। বন্ধুরা অনুরোধ করলো, সাথীরা চোখের জলে অনুনয় জানালো, 'চলো, তোমাকে দূরে, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই যেখানে হানাদারেরা তোমায় কোনোদিন খুঁজে পাবে না।'

প্রতিবার মহানায়কের মুখে একই উত্তর, 'না, আমি যাবো না। শত্রুসেনা আমাকে না পেলে ঢাকা শহর তছ্‌নছ্ করে ফেলবে, আমার দেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আমি যাবো না। যদি মৃত্যু আসে আসুক, আমার দেশের মানুষের মাঝে, তাদের সংগে

মরতে চাই।" আদেশ দিলেন সাথীদের—"আমার নির্দেশ, এই মুহূর্তে তোমরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও।"

নির্দেশানুসারে বন্ধু আর সাথীরা চলে গেলেন। মহানায়ক একা বসে আছেন। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ক্রোধে চোখ দুটো জ্বলে উঠছে। আবার পর মুহূর্তে এক অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠছে। কানে আসছে অবিরাম রাইফেল, মেশিনগান আর কামানের গর্জন, আহত মানুষের কাতর আর্তনাদ। সহচর সংবাদ নিয়ে এলো: ঢাকা, খুলনা, কুষ্টিয়ায় প্রায় লক্ষাধিক লোককে হত্যা করেছে হিংস্রপশুর দল। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ডতায়। কঠিনকণ্ঠে বললেন, —"আমার শেষ নির্দেশ নাও, প্রতিটি শহরে, গ্রামে আমার সংগ্রামী সাথীদের বেতার মারফত আমার নির্দেশ জানিয়ে দাও। বিদেশী শত্রু-সৈন্য বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে রাতের অন্ধকারে। ঢাকা, খুলনা, কুষ্টিয়ায় তারা লক্ষাধিক ঘুমন্ত লোককে হত্যা করেছে। এই বর্বর আক্রমণ এবং অবাধ গণহত্যার কথা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে জানিয়ে দাও। বাংলার সন্তান যে যেখানে আছো, হাতের অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াও বিদেশী শত্রুর পশুশক্তির বিরুদ্ধে। হানাদারদের প্রতিহত করো।"

মহানায়কের নির্দেশ। মুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা, শংকা, ভীতি, মৃত্যুকে জয় করলো সারা বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী সাড়ে সাত কোটি জনতা। মহানায়ক শেখ মুজিব বন্দী, তাতে পরোয়া নেই: তাঁর নির্দেশ রয়েছে জাতির জন্যে "আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রাস্তাঘাট যা যা আছে, সমস্ত কিছু—আমি যদি হুকুম দিবার না পারি—তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ওদের ভাতে মারবো—আমরা পানিতে মারবো।… আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

…তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইন্‌শা আল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে জেগে উঠলো বাংলাব মানুষ। মুজিবের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো কোটি কোটি কণ্ঠে—"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

২৬শে মার্চ সূর্য সেনের চট্টগ্রামের অসমসাহসী দশজন তরুণ মুক্তি-যোদ্ধা চট্টগ্রাম বেতার-কেন্দ্র দখল করে বসলেন। নরঘাতক টিক্কা খানের বেতার ভাষণ প্রচার বন্ধ করে দিলেন। কালুরঘাট-চান্দগাঁওতে রিসিভিং ও ট্রান্সমিশন সেণ্টার। নয় মাইল দূরে আগ্রাবাদে ব্রডকাস্টিং হাউস্‌। বেলা একটায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন তাঁরা। বংগবন্ধু শেখ মুজিবের শেষ নির্দেশ বাণী প্রচার করা হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে রক্ষা করতে হবে। ২৭শে মার্চ তাঁরা ছুটলেন বোয়ালখালি থানার ফুলতলী ঘাঁটিতে। দেখা করলেন চট্টগ্রামে মুক্তি-বাহিনীব অধিনায়ক মেজর জিয়ার সংগে।

'চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করেছি, এখন বেতার কেন্দ্র রক্ষা করুন।'—আবেদন জানালেন তাঁরা।

আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দুর্জয় মুক্তিযোদ্ধাদের। মেজর জিয়া ছুটলেন আগ্রাবাদ। কড়া পাহারা বসালেন বেতার কেন্দ্রের চারপাশে।

২৭শে মার্চ রাত এগারোটায় মেজর জিয়া বংগবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে মুক্তি-যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দিলেন। পূর্ণোদ্যমে চালু হলো স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র। ৩০শে মার্চ বেলা ছুটো দশ মিনিটে পাক সরকারের বোমারু বিমানের প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ আর মেসিনগানের গুলিতে কেঁপে উঠলো স্বাধীন

বাংলা বেতার কেন্দ্র। পাক-সেনার পুনরাক্রমণ আসন্ন জেনে ৩১শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কন্দ্রের সেই অকুতোভয় দশজন মুক্তি-যোদ্ধা এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার dismantle করে চব্বিশ মাইল দূরে নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে সরিয়ে, আরো দূরে মুক্তাঞ্চলেব এক গভীর জংগলে নিয়ে গেলেন। ৩রা এপ্রিল থেকে স্বাধীন বেতার কেন্দ্র আবাব চালু করলেন চট্টগ্রামের দশজন অজেয় মুক্তিযোদ্ধা।

হানাদার পাক-সেনারা বগুড়া শহর আক্রমণ করলো ২৬শে মার্চ ভোরে। মাত্র আটাশটি একনলা, দো-নলা বন্দুক এবং টু-টু বোব রাইফেল নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন বগুড়াব মুক্তি-সেনারা। প্রচণ্ড মাব খেয়ে কিছু হটে গেলো পাক-সেনা।

২৭শে মার্চ পাক-সেনা আবার বগুড়া শহর আক্রমণ করলো। ঐদিন বগুড়াব পুলিশ-বাহিনী এসে মুক্তি-সেনাদেব সংগে যোগ দিলেন। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে হানাদাব সৈন্যকে কিছু হটতে হলো।

২৮শে মার্চ ও ২৯শে মার্চ প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরও খান-সেনারা বগুড়া শহর দখল করতে সক্ষম হলো না। ৩০শে মার্চ তারিখে রাজশাহীর নওগাঁ থেকে ই. পি. আর. এসে বগুড়ার মুক্তি-যোদ্ধাদের শক্তিবৃদ্ধি করলেন। ইতিমধ্যে মেজর নজমুল হকের নেতৃত্বে নওগাঁ মহকুমার পূর্ণ কর্তৃত্ব মুক্তিবাহিনী গ্রহণ করেছেন। ৩১শে মার্চ বগুড়া শহরের ওপর পাক-বিমানবাহিনী আক্রমণ চালালো। বিমান থেকে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ আর মেসিন গান চালিয়েও মুক্তি বাহিনীকে পিছু হটানো গেলো না। ৩১শে মার্চ দিবাগত রাত্রে মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। সে আক্রমণ সহ্য করবার মতো শক্তি কিংবা মনোবল পাক-সৈন্যের ছিলো না। রাতের অন্ধকারে তারা দ্রুত পা চালিয়ে রংপুর শহরের ছাউনিতে আশ্রয় নিলো।

১লা এপ্রিল বগুড়ায় মুক্তিবাহিনী বগুড়া শহর থেকে ৯ মাইল দক্ষিণে পাক-সেনাদের আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করলেন। জংগী বিমান থেকে মুক্তিবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালিয়েও পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট রক্ষা করতে সক্ষম হলো না। মাত্র ৩ ঘণ্টা যুদ্ধেব পর মুক্তিবাহিনীর হাতে আড়িয়া ক্যান্টনমেন্টের পতন হলো। ৫৬টি ট্রাক বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ মুক্তি-সেনেরা দখল করলেন।

শুধু চট্টগ্রাম, বগুড়া নয়, বাংলা দেশেব প্রতিটি জেলায় প্রতিটি শহরে প্রতিটি গ্রামে বাংলাব মানুষ হাতের কাছে যা পেলো তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ববব শক্র সৈন্যের ওপর। নৌবাহিনীর আক্রমণ, বিমান আক্রমণ, মর্টাব, মেসিনগান, ট্যাঙ্কেব আক্রমণের বিরুদ্ধে সামান্য, একনলা বন্দুক, দোনলা বন্দুক আব পুবনো মরচে-পড়া রাইফেল নিয়ে রুখে দাঁড়ালো বাংলাদেশের মুক্তিপাগল জনতা। এদের সংগে যোগ দিলেন ইস্টবেংগল রেজিমেন্টের দুর্ধর্ষ বাংগালী যোদ্ধারা। পাবনায় এবং কুষ্টিয়ায় মুক্তিবাহিনী হানাদার পাক-সেনাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ২টি শহর দখল করলেন। ক্যাপ্টেন আশরাফ এবং ক্যাপ্টেন আনোয়াবের নেতৃত্বে সমগ্র দিনাজপুব জেলা এবং রংপুর শহর ছাড়া সমস্ত রংপুর জেলা মুক্ত হলো। মেজর ওসমানের নেতৃত্বে এবং ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাক-সেনাদের যথাক্রমে যশোব এবং রাজশাহী ছাউনীর মধ্যে অবরুদ্ধ করলেন। মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে সিলেট মুক্ত হলো। মুক্তিবাহিনী শত্রুমুক্ত করলো কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলাকে। প্রতিদিন অসংখ্য পাকসেনার মৃত্যুতে ভীতিগ্রস্ত দিশেহারা সামরিক শাসক টিক্কা খান তলব পাঠালো পিণ্ডিতে—"আরো অস্ত্র চাই, আরো সৈন্য চাই।"

একটি স্বাধীন জাতির জন্ম হলো রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে। ঘোষিত

হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাষ্ট্র। ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১ সন। স্বাধীন বাংলা বেতাব কেন্দ্র থেকে ঘোষিত হলো ছয়জন সদস্যবিশিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ সবকাবেব নাম :

রাষ্ট্রপতি : শেখ মুজিবুব বহমান।

উপ-বাষ্ট্রপতি ও অস্থাযী বাষ্ট্রপতি : জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

প্রধান মন্ত্রী : জনাব তাজউদ্দীন আহমদ।

অন্যান্য মন্ত্রী : জনাব ক্যাপ্টেন মনসুব আলী, জনাব খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, জনাব আবু হেনা কামরুজ্জামান।

মুক্তাঞ্চলেই গঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলা দেশ সবকাব। এই সবকাব নির্বাসিত সবকাব নয়। ১৮ই এপ্রিল, ৩বা বৈশাখ, কুষ্টিয়ার মুজিবনগবেব আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভা আত্মপ্রকাশ কবলো। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীব আম্রকাননে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হাবিয়েছিলো। সেই প্রাচীন জেলাব আব এক আম্রকাননে স্বাধীন বাংলা সবকাবেব শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলো ১৯৭১ সালে।

আনুষ্ঠানিক ভাবেই পাকিস্থান থেকে বাংলা দেশ বিচ্ছিন্ন হলো। মানসিক দিক থেকে বাংলা দেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো অনেক আগেই। অনেক আগেই পাকিস্তান খণ্ডিত হয়েছিলো। 'Integrity of Pakistan, Integrity of Pakistan' বলে পাক সরকারের আর্তনাদেব মধ্যেই Disintegrity-ব স্বাভাবিক সত্যটি খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৯৭০ সালে ঘুর্নিঝড়ে শাসক-চক্র কর্তৃক বাংলার মানুষেব দুর্দশাব প্রতি চবম উপেক্ষা প্রদর্শনেব ফলে বাংলার মানুষের মন প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। নির্বাচনে পাকিস্তান ভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দলই পশ্চিম পাকিস্তানে এবং বাংলা দেশে একই সংগে কোন আসন লাভ করতে পারেনি। ভুট্টোর দলের বাংলা দেশে কোন অস্তিত্বই ছিলো না। অন্যান্য দল বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। এ সত্যটি বুঝেছিলেন বলেই বাস্তবপন্থী মওলানা ভাসানী, তাঁর

দল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে কেটে বাদ দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণীর লুণ্ঠনের লোভ, হঠকারিতা, ষড়যন্ত্র, পাশবিকতা এবং দানবীয় হত্যালীলা সেই মানসিক বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক রূপ দিলো। "পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য মানব সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে।"

(বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ)

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণী আর ইয়াহিয়ার সামরিক-চক্র কখনো বাংলাদেশকে নিজের দেশ ভাবতে পারেনি। অন্যথায় নারীধর্ষণ, লুঠতরাজ, অবাধ গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং নির্বিচার ধ্বংসলীলার এ-ঘৃণ্য নজীর তারা কখনই স্থাপন করতে পারতো না। কসাইয়ের এই ধ্বংসলীলা জাতীয় ঐক্যের মধুর বাণী ব্যক্ত করে না; বর্ণগত বিদ্বেষ, একটা জাতিকে ধ্বংস ক'রে তার সমাধির ওপর শোষণের দুর্গ তৈরী করার পৈশাচিক মানসিকতাকেই প্রকাশ করে।

বাংলা দেশে আজ স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন বাংলা দেশ সরকার বিশ্ববাসীর কাছে দাবী করেছে স্বীকৃতি—গণতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশের স্বীকৃতি। আন্তর্জাতিক টালবাহানা চলেছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার হিসেব-নিকেশ! বিবেক-বর্জিত ব্যবসায়ী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সরকার প্রমাণ করতে চায় 'এটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার।' ধিকৃত মানবতার যুক্তি। বাস্তবকে তারা অস্বীকার করতে চায় নিজ স্বার্থের খাতিরে। একটা জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা ঘরোয়া ব্যাপার? সহস্র সহস্র রমণীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা ঘরোয়া ব্যাপার? একটা দেশের, একটা জাতির বুদ্ধিজীবী যুবকদের, ছাত্রদের, বিজ্ঞানীদের নির্মূল করবার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা

ঘরোয়া ব্যাপার ? অথচ ভিয়েতনামের ঘটনা ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ঘরোয়া ব্যাপার নয় কোরিয়া, লাওস, কাম্বোডিয়ার ঘটনাবলী। নিজস্ব স্বার্থবুদ্ধিতে, মহাজনী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির পংকিল সলিলে আজ বিশ্ববিবেক নিমজ্জিত। তাদের বিকৃত স্বার্থ আজ তাদের আত্মাকে বিক্রীত করেছে লোভ-লালসা-বিকৃত স্বার্থবুদ্ধির কাছে। কিন্তু বিকৃত-বিবেক বিশ্বের নিকট বিক্রীত হয়নি বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। আত্মপ্রত্যয়ী সংকল্প নিয়ে তারা লড়ছে। তারা তাদের শত্রুকে চিনেছে ; চিহ্নিত করেছে। চিনেছে তাদের শত্রুদের সহযোগীদের। দুর্জয় সংকল্প নিয়ে তারা লড়ছে বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চি মাটির জন্যে, প্রতিটি শত্রুর বিরুদ্ধে, শত্রুর সহযোগীদের প্রেরিত মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধে লড়ছে বাংলার প্রতিটি মানুষ, বাংলার বাংগালী সত্তা, –বাংগালী আত্মা। এই যুদ্ধে তাদের ক্লান্তি নেই, চোখে অশ্রু নেই, নেই হারানো সংগীদের জন্যে কোন শোক। তারা জানে, যুদ্ধে তাদের জয় নিশ্চিত ; রাত্রিশেষে প্রভাতী সূর্যের মতো অনিবার্য। যুদ্ধ শেষে তারা ক্ষণিকের জন্যে কাঁদবে তাদের হারানো সংগীদের স্মরণ করে। তারপর মুহূর্তে চোখের জল মুছে ফেলে তারা হাসবে, একটা জাতিকে নোতুন ভাবে গড়ে তোলার দৃপ্ত শপথ নিয়ে, হাসবে নোতুন সৃষ্টির মহা আনন্দে।

মহানায়ক ফিরে এলেন

১৯৭২ সালেব ১০ই জানুয়ারীর আনন্দমুখর বিকেলটি। বিকেলের মুঠো মুঠো শেফালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে রেস্ কোর্সের ময়দানে, ঢাকা শহরে, সারা বাংলা দেশে। অনেক অনেকগুলো অশ্রু-ঝরা দিন-শেষে হেসে উঠেছে বাংলার মানুষ। বাংলার মহানায়ক বংগবন্ধু শেখ মুজিব ফিরে এসেছেন বাংলার মাটিতে।

রেস কোর্সে সভামঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। মঞ্চের চারপাশে ঘিরে আছে লক্ষ লক্ষ জনতা। অধীর আগ্রহে তারা প্রতীক্ষা করছে তাদের প্রিয় বন্ধুকে একটিবার দেখবাব জন্যে, একটিবার তাঁর দরদী কণ্ঠটি শোনবার জন্যে। সুদীর্ঘ দু'শ নব্বুইটি দিন তারা দেখেনি তাঁকে। জংগীশাহীর পাষাণ-দুর্গে বন্দী ছিলেন বাংলার প্রমিথিয়ুস। প্রমিথিয়ুস আজ মুক্ত।

"The Titan is unvanquished still"

আজ এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছে বিগত কয়েকটি মাসের কথা। নয়টি রক্তঝরা মাস। বাংলার মানুষের চোখের জলে ভেজা নয়টি মাস। বাংলার বুক থেকে প্রতি মুহূর্তে রক্ত ঝরেছে, চোখ থেকে ঝরেছে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সোনার বাংলার দেহকান্তি। নয়টি মাস ধরে চলেছে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। প্রতিটি ইঞ্চি মাটির জন্যে লড়াই করেছে বাংলার সোনার ছেলেরা। দুর্জয় শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপর, অতর্কিত হামলা করে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে শত্রুর রক্ষাব্যূহ, শত্রুর রক্তে বাংলা মায়ের বন্দনা করেছে। গ্রামের প্রতিটি দুর্গ থেকে আঘাত করেছে দেশপ্রেমিক গেরিলা যোদ্ধারা। বাংলার দুর্জয় সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে আতঙ্কিত হানাদার পাক-সৈন্য, দিশেহারা বর্বর শাসকচক্র। শেষ

চাল দিলো পাকিস্তানী শাসকচক্র। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করলো।

৪ঠা ডিসেম্বরের রাত্রি ১টায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধরা-গলায় ঘোষণা করলেন, "আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি। পাকিস্তান ভারত ভূখণ্ড আক্রমণ করেছে। আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।"

শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী আট মাস ধরে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছে বিশেষ দূত পাঠিয়েছেন, স্বয়ং ধর্ণা দিয়েছেন তাদের দুয়ারে, বলেছেন বাংলাদেশে হানাদার পাক-বাহিনীব নির্মম অত্যাচারের কথাঃ শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার-স্বাধিকাব দাবি করবাব জন্যে পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশে, ধর্ষিতা হচ্ছে বাংলার মা-বোনেরা; গৃহহাবা হয়ে এককোটি লোক শরণার্থী হয়েছে তাঁর দেশে। কিন্তু তাঁব আবেদনে সাড়া দেয়নি বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রের বধির সরকারগুলো; ক্ষান্ত হলো না পাকিস্তানী জল্লাদদের নির্মম হত্যাকাণ্ড। শক্তিশালী নিক্সন সরকারের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানী শাসকচক্র আক্রমণ করেছে ভারতীয় ভূখণ্ড। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সৃষ্ট—এই মিথ্যে প্রচার করে বিশ্ব-জনমতকে বিভ্রান্ত করবার অপপ্রয়াসে মেতে উঠলো পাকিস্তানী জংগীশাহী এবং তার সহযোগীরা। ভারত আক্রমণ-কারী, ভারত পাকিস্তানকে গ্রাস করতে চায়,—এই মিথ্যে অভিযোগে তারা অভিযুক্ত করলো ভারতকে। মিথ্যে প্রচারের জবাব দিলেন ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে, ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। তুমুল করতালি এবং হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন, ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি ঘোষণা। সেদিন ভারত-বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আনন্দের বান বয়ে গেলো। ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হাতে হাত রাখলো; এগিয়ে চললো দুর্বার গতিতে

শত্রুর দুর্গে শেষ আঘাত হানবার জন্যে। মানুষের মুক্তির সংগ্রামে বাংগালীর রক্তের সাথে ঝরলো ভারতীয় রক্ত। দুই দেশের রক্তে রক্তে স্বাক্ষরিত হলো মৈত্রীর সনদ।

মনে পড়ে সেদিন মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রে যখন স্বীকৃতির এ খবর পেঁ ৗছালো, তখন উল্লাসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। হাসছিলাম নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে। তারপরে একসময়ে দেখি অজান্তে দু' চোখের কোণ বেয়ে ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে পড়ছে, বেদনার সাগর ছাপিয়ে আনন্দের কয়েক বিন্দু অশ্রু। আমার দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সরকার এবং তার জনগণ। আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি; এক মহান স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের স্বীকৃতি মিলেছে।

"The toil which stole from thee so many an hour,
Is ended,—and the fruit is at thy feet !"

দ্রুতগতিতে ঘটনাস্রোত এগিয়ে চললো। দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চললো মুক্তিসেনা আর মিত্রবাহিনী। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাক-বাহিনীর গর্ব দুর্ভেদ্য যশোহর দুর্গের পতন হলো। দু'হাজার ট্রাক, অস্ত্র-শস্ত্র এবং গোলাবারুদসহ পাক-হানাদারবাহিনী যশোহরে আত্মসমর্পণ করলো। যশোহরের পতনে হানাদারবাহিনীর রক্ষাব্যূহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কুষ্টিয়া, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিং, সিলেট, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা—একের পর এক-একটি শহর দ্রুত শত্রুমুক্ত হলো। অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাংগাইল মুক্ত হয়েছিলো অনেক আগে। টাংগাইল মুক্ত করার পর কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনী নিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে গেলেন ঢাকার দিকে। অন্য তিন দিক থেকে ঢাকা অবরোধ করলেন মিত্রবাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিসেনা।

সমুদ্রপথ অবরুদ্ধ। স্থলপথ, বিমান-যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ রুদ্ধ আক্রোশে হানাদারবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে এগিয়ে আসছে। পাকসেনার অধিনায়ক মেজব জেনারেল ফরমান আলী জাতিসংঘে আবেদন পাঠালেন, 'প্রভুরা রক্ষা করো; বাংলাদেশ থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাও।'

নিরাপত্তা পবিষদের জরুরী অধিবেশন বসলো। প্রস্তাব আনলো মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি : 'যুদ্ধ বন্ধ করো : ভারত, সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাও সীমান্তের পারে।' রাশিয়া ভেটো প্রদান করলো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবাখেলায় রাশিয়া মার খেয়েছে কয়েকবার। আর নয়, এবার জবাব দিতে হবে। রাশিয়ার বিরোধিতায়, পর পর হু'বার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে নাকচ হয়ে গেলো। দমবার পাত্র নয় নিক্সন সবকার। অকালবোধন হলো। মার্কিন প্রস্তাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন ডাকা হলো। ভোটাধিক্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হলো। ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন : 'তোমাদের সিদ্ধান্ত মানিনে। বাংলাদেশ স্বীকৃত সত্য। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে ডাকতে হবে, তাদের বক্তব্য শুনতে হবে। অন্যথায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভাবত গররাজী।' 'জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিবেক-বিবেচনা-বর্জিত প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারের ওপর বাধ্যকর নয়'—ঘোষণা করলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গর্বিত নিক্সন সরকারের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। এ বেয়াদবির সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। মার্কিন নাগরিক অপসারণের মিথ্যে অজুহাতে সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলো সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার। নিক্সন সরকারের দাম্ভিক হঠকারিতায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন সোভিয়েট সরকার। সোভিয়েট রণতরী এগিয়ে চললো

ভারত মহাসাগরের দিকে। শুধু সোভিয়েট নয়, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি শান্তিকামী রাষ্ট্র মার্কিন সরকারের আচরণের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলো। এমন কি নিক্সন সরকারের এই 'রণতরী নীতি'র তীব্র সমালোচনা করলেন চীন সরকার। বিশ্ব-জনমতের চাপে পিছু হটলো আমেরিকা। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে ঢুকে শুধু পাঁয়তারাই দেখালো, বাংলাদেশের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হলো না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তায় বাংলাদেশকে চিরপদাবনত করে রাখার শেষ পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো।

নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হলো ১৬ই ডিসেম্বর। সেদিন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজী, ভারতীয় সেনাধ্যক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ত্যাগ করলেন। দানবীয় দম্ভের পতন ঘটলো অবশেষে। সুদীর্ঘ নয় মাস পরে রাজপথে নেমে এলো শৃঙ্খলমুক্ত ঢাকার মানুষ। হাসি উল্লাসে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। তারপর যেন এক অসহ্য বেদনায় নির্বাক হয়ে গেলো।

এখনও ফিরে আসেননি তিনি। পশ্চিম পাকিস্তানের এক নির্জন কারা-প্রকোষ্ঠে বন্দী বাংলার মহানায়ক শেখ মুজিব। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাঁরই প্রয়োজন যে সব চাইতে বেশী। বাংলাদেশের কোটি হৃদয়ের একটি কামনা শূন্যে ছড়িয়ে পড়লো 'হে বিধাতা ফিরিয়ে দাও তাঁকে।' ব্যর্থ হয়নি মানব হৃদয়ের সে আকুল কামনা।

ঢাকার পতনের সংগে সংগে পিণ্ডির রাজনৈতিক-মঞ্চে নোতুন খেলা শুরু হলো। ভুট্টোকে ডেকে পাঠানো হলো পিণ্ডিতে। আমেরিকা থেকে ভুট্টো ছুটে এলেন। বিমান বন্দর থেকে সোজা গিয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ-ভবনে। পাকিস্তানের চিরন্তন প্রাসাদ-চক্রান্তের রাজনীতিতে ভুট্টো এবার দাবার ব'ড়ে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় লৌহমানব (!) ইয়াহিয়া খানতে সরে যেতে হলো।

নোতুন সামরিক জান্তা পুরনো জান্তাকে হঠিয়ে দিলো গদী থেকে। সারা দুনিয়া ভুট্টোর মুখ থেকে একটি ঘোষণা শোনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলো। অবশেষে কয়েকদিন পরে পাক বেতারে ঘোষণা করা হলো, 'শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে বের করে এনে একটি বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। ভুট্টো তাঁর সাথে দেখা করবেন।'

বাংলাদেশের মানুষ তথা সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বেঁচে আছেন শেখ মুজিব, বাংলার মহান নায়ক। আর তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না ধিক্কৃত নরঘাতকের দল।

ভুট্টোর সংগে কয়েক দফা বৈঠক হলো তাঁর। ভুট্টো চাইছিলেন শেষ রক্ষা করতে। অনুরোধ জানালেন বারবার, যে-কোন প্রকারে ঢিলে-ঢালা রকমের এক-পাকিস্তানী-কাঠামো রক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু বংগবন্ধুর এক উত্তর ! কারাগৃহের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আমি বন্দী। সারা বিশ্বের সংগে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। আমি আমার বাংলার কোন খবর জানিনে। আমাকে আমার বন্ধু, সহকর্মী, দেশবাসীর কাছে সব কিছু জানতে হবে। তারপর আমি আমার মতামত জানাতে পারি।

অবশেষে ভুট্টো ঘোষণা করলেন : শেখ মুজিবকে বিনা-শর্তে মুক্তি দেওয়া হবে। এবং তাঁর মুক্তির পূর্বে ভুট্টো আর একবার তাঁর সাথে দেখা করে আলোচনা করবেন।

ভুট্টোর ঘোষণায় আনন্দের একটা দমকা ঝড় বয়ে গেলো বাংলাদেশের বুকে। সমস্ত রাত ধরে চললো আনন্দের বল্গাহীন উদ্দাম উল্লাস। মুখর হয়ে উঠেছে মুক্ত বাংলার আকাশ। প্রাণ ফিরে পেয়েছে শ্মশান বাংলার মাটি। শুরু হলো আকুল অধীর প্রতীক্ষা—মহানায়ককে ফিরে পাবার প্রতীক্ষা।

৮ই জানুয়ারী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান রাষ্ট্রপতি মুক্তি পেলেন শত্রু-কারাগার থেকে। কিন্তু তাঁকে বাংলাদেশে না পাঠিয়ে বিমানযোগে গোপনে পাঠানো হলো লণ্ডনে। রাত চারটায়

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে বিদায় দিলেন। বংগবন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তানী বিশেষ বিমানটি বাংলাদেশ সময় ১২-৩৫ মিনিটে লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। বিমানবন্দরে বংগবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানালেন গ্রেটবৃটেনের পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ-এশিয়া সংক্রান্ত প্রধান মিঃ আয়ান সাদারল্যাণ্ড, শ্রমিক-দলীয় পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ ব্রুস ডগলাস ম্যান এবং মিঃ পিটার শোর।

লণ্ডনের মাটিতে পা রেখেই বংগবন্ধু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সংগে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনকে প্রথম কথাটি জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যালো তাজউদ্দীন? আমার দেশের মানুষ কেমন আছে? বর্বর পাকসেনা কি আমার দেশবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে?'

লণ্ডনে বাংলার মহানায়ক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। বলেছেন তাঁকে হত্যা করবার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা। ফাঁসীর হুকুম হয়েছিলো তাঁর। ইয়াহিয়া খান তাঁকে ফাঁসী দিতে চেয়েছিলো। সেলের পাশে তাঁর কবর পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছিলো। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে অনুরোধ করে বলেছিলোঃ শেখ মুজিবকে হত্যা না করে আমি বিরাট ভুল করেছি। হয় তাকে হত্যা করবার জন্যে আমাকে সময় দাও, অন্যথায় কথা দাও তুমি তাকে হত্যা করবে।"

ইয়াহিয়ার এই বিবেক-বর্জিত প্রস্তাবে ভুট্টো রাজী হতে পারেন নি। শেখ মুজিবকে হত্যা করে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বরঞ্চ সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করবে। মিত্রবাহিনীর হাতে তিরানব্বই হাজার পাক-সেনা বন্দী হয়ে আছে। তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যে বংগবন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা' ছাড়া বিশ্ব-জনতা শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে মুখর হয়ে উঠেছে। ভুট্টো তাদের কী কৈফিয়ৎ দেবেন! ভুট্টো ইয়াহিয়ার প্রস্তাব

প্রত্যাখান করলেন। রক্ষা পেয়ে গেল বংগবন্ধুর মহামূল্য জীবন। বংগবন্ধু বলেছেন : 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভুট্টোর সৌভাগ্য কামনা করি।'

মৃত্যুর জন্যে বংগবন্ধু প্রস্তুতই ছিলেন। যেদিন তিনি জেলে যান সেদিন তিনি জানতেন, যে হয়তো জেলের নির্জন প্রকোষ্ঠে তাঁর জীবনাবসান হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে। সংবাদিক-দের লক্ষ্য করে তিনি বললেন : "আজ আমার দেশের মানুষ মুক্ত, পশ্চিম-পাকিস্তানের মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই।"

বিশ্বের সাংবাদিকরা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনেছে বাংলার মহানায়কের এই উদার ঘোষণা।

লণ্ডনে বংগবন্ধু বিশ্রাম নিতে পারেননি। বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে নেই। মন তাঁর উন্মুখ হয়ে আছে দেশের মাটির জন্যে, দেশের মানুষকে দেখবার জন্যে। লণ্ডনের বিমান বন্দর থেকে রাজকীয় বিমান বাহিনীর কমেট বিমানটি ডানা মেলে আকাশে উড়লো। মেঘের স্তর ভেদ করে কিছুক্ষণ একটানা উড়বার পর আজ সকাল সাড়ে আটটায়, শ্বেত পায়রার মতো শ্বেতশুভ্র বিশেষ বিমানটি বাংলার মহানায়ককে নিয়ে পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করে। লণ্ডন থেকে স্বদেশের পথে দিল্লীতে এক আবেগ-আপ্লুত সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন ভারত সরকার। বংগবন্ধু বিমান থেকে বেরিয়ে আসার সংগে সংগে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি তাঁকে স্বাগত সম্বর্ধনা জানালেন। সম্বর্ধনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

২১ বার তোপধ্বনিতে পালাম বিমান বন্দরের মাটি কেঁপে উঠলো। সংগে সংগে বেজে উঠলো দুই দেশের জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" আর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।' 'জয় বাংলা', 'জয়হিন্দ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো।

পথে পথে ছড়িয়ে দেয়া হলো গোলাপ আর গাঁদা ফুলের পাপড়ি। বিমান বন্দরের চারদিকে সারি সারি উড়ছিলো দুই দেশের জাতীয় পতাকা।

বিমান বন্দরে বংগবন্ধু ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন। তাঁর চলার পথে ছড়ানো লাল গালিচা, আর রাশি রাশি ফুল। বাংলার মহানায়ককে স্বাগত জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি বললেন: 'বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের দেশে স্বাগত জানাতে পেরে আমি প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করছি। আমার সরকার ও আমাদের জনগণ এই মহান ক্ষণটিরই প্রতীক্ষায় ছিলেন।'

সকালে ঘরে বসে আকাশ বাণীব ধারার বিবরণী শুনছিলাম। পৃথিবীর ইতিহাসে আর এমনটি কখনও ঘটেনি। কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি তার দেশের আগে বিদেশে সম্মানিত এবং সম্বর্ধিত হয়েছেন এমন নজির ইতিহাসে দ্বিতীয় আর একটি নেই। ধারা বিবরণী শুনতে শুনতে বার বার চোখে জল আসছিলো আনন্দে, আবেগে এবং এক অসহ্য বেদনায়।

দিল্লীতে সংক্ষিপ্ত সময় কাটিয়ে সেই শ্বেতশুভ্র বিমানটি আবার আকাশে উড়েছিলো। এবার ঢাকায় মায়া-ভরা বাংলার মাটিতে।

আঁধারের বুক চিরে আলো ফুটবার আগেই জেগে উঠেছে আনন্দ-বেদনা-বিবশা ঢাকা নগরী। পথে পথে তোরণের পর তোরণ। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে রাজপথের দু'পাশের দেয়াল। বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো মানুষ ছুটেছে রেস্ কোর্স ময়দানে, আর বিমান বন্দরে, একটু ভালো জায়গা পাবার জন্যে; খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখবার, তাঁর একটু স্পর্শ পাবার আশায়। রেস্ কোর্সের ময়দান থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে, গাছের ডালে, বাড়ীর ছাদে শুধু লোক আর লোক। তারা শ্লোগান দিচ্ছে, তারা নাচছে, তারা হাসছে, তারা একে অপরকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে।

ডানা মেলে শ্বেত শুভ্র বিমানটি ১টা ৪২ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেছে। উল্লাসে ফেটে পড়েছে বিমান বন্দর। করতালি দিয়ে সবাই স্বাগত জানিয়েছেন বাংলার মহানায়ককে। বিমানের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন বংগবন্ধু শেখ মুজিব। স্বাগত জানালেন তাঁকে সহ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ। গোলাপের মালায় তাঁকে প্রায় ঢেকে দিয়েছেন বিপ্লবী চার ছাত্র নেতা নুরে আলম সিদ্দীকী, শাহজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আব্দুর রব এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন, যাঁরা স্বাধীন বাংলার মানুষকে দিয়েছেন দুটি অমূল্য উপহার 'জয় বাংলা' শ্লোগান, আর বাংলা দেশের জাতীয় পতাকা। বাংলার তরুণ শক্তি বাংলাকে রক্তের উপহার দিয়েছে বারবার, বাংলার মানুষকে দিয়েছে পথের নিশানা, দিয়েছে মুক্তির আস্বাদ।

বিমানবন্দরে অনেককেই দেখেছি; দেখিনি টাংগাইলের বীর সন্তান কাদের সিদ্দিকী আর আনোয়ারুল আলম শহীদকে। হয়ত তাঁরা বিমান বন্দরের জনারণ্যে হারিয়ে গেছেন, অথবা আটকে পড়েছেন টাংগাইলকে গড়ার কাজে। কাদেরকে দেখিনি কখনো, তাঁর ছবি দেখেছি। শহীদ মুজিবনগরে ছবিটি আমাকে দিয়ে এসেছিলেন; তাঁদের দু'জনের একটি ছবি। শহীদ আর কাদের দু'জনে দাঁড়িয়ে। সুদৃঢ় প্রত্যয়ে ইস্পাতের মতো দু'টি চেহারা। ঝক্ঝক্ করছে। কাদেরের দুটি চোখে আগ্নেয়গিরির জ্বালা। শহীদের মুখে অদ্ভুত কমনীয়তার ছাপ।

শহীদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একটি অবান্তর প্রশ্ন: আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাক সেনাদের বিরুদ্ধে তোমরা কী করে শেষ পর্যন্ত লড়বে?

আমার কণ্ঠে হয়তো এই দুঃসাহসীদের জন্যে একটি অসহায় দরদের সুর ফুটে উঠেছিলো।

শহীদ মিষ্টি করে আমার দিকে তাকালো, তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ নরম গলায় বললে : আমরা আমাদের মাঠ-ঘাট-পথ চিনি। আমরা ওৎ পেতে বসে থাকি, তারপর সুযোগ পেলেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি—তাদের ধ্বংস করি। কখনো বা মুখোমুখি লড়াই করি। প্রতিটি যুদ্ধেই ওরা আমাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। আমরা এখনো হারিনি। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাংগাইলকে আমরা মুক্ত করেছি।

—টাংগাইলের সাধারণ মানুষ তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ?—আবার প্রশ্ন করি।

শহীদ এবার একটু হাসলো : কেন করবে না ? আমরা যে তাঁদের ছেলে। আমরা যে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্যে লড়ছি। আমাদের অধিনায়ক কাদেরকে সকলে ভালবাসে। তার একটি কথায় তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তারপর কতকটা আত্মগতভাবেই বললো : আমরা রক্তের শপথ নিয়েছি বাংলাকে আমরা মুক্ত করবো। বাংলার মানুষকে আমরা শোষণমুক্ত করবো।

বড় ভালো লাগলো শহীদকে। কাদের সিদ্দিকীর প্রতি তার শ্রদ্ধা বিস্মিত করলো। কেমন যেন মায়া হলো বাংলার এই দুরন্ত ছেলেটির প্রতি। বললাম : ঈদের মাত্র তিন দিন বাকী। আমার সংগে ঈদ করে যাও। ঈদের পরে যেও।

একটু যেন সচকিত হয়ে উঠলো শহীদ। বোধহয় মনে পড়ে গেছে - তার বাবা, মা, ভাই বোনের কথা। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললে, না ভাই আর বাঁধবেন না। আমি আজই ফিরে যাবো। আমি আমার সাথীদের সংগে ঈদ করতে চাই।

আর অনুরোধ করিনি। শহীদ বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলো। বুকটা একটা অসহ্য বেদনায় টনটন করে উঠেছিলো। ইচ্ছে হচ্ছিলো চীৎকার করে বলি, 'জীবনে যদি কখনো কোনো পুণ্য করে থাকি, তবে তার সবটুকু তোমাদের দিলাম। তোমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।'

কাদের সিদ্দিকী টাংগাইলের শক্তির মূর্তিমান প্রকাশ। তাকে দু'চোখ মেলে খুঁজছিলাম বিমান বন্দরে।

নাঃ, নেই। কাদের, শহীদ এরা আসেনি। এরা হয়তো তখন টাংগাইলের কোন দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, কিংবা গড়ে তুলছে শ্মশানের ভস্মরাশির ওপর সর্বহারা মানুষের নয়া জীবনের বুনিয়াদ।

বিমান বন্দরে দেখিনি আর একজনকে। তিনি শতাব্দীর আর এক মহানায়ক—মওলানা ভাসানী। অসুস্থাবস্থায় তিনি দিল্লীতে আছেন।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমাদেব চারপাশে ঘিবে রয়েছে লক্ষ লক্ষ জনতা। আকুল আগ্রহে তারা প্রতীক্ষা করছে বংগবন্ধুব। কিছুক্ষণেব মধ্যে তিনি এসে পৌছবেন রেস্ কোর্সের ময়দানে। লক্ষ লক্ষ জনতা। কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী, মায়েরা—সবাই এসেছেন। হারানোর ব্যথা তাঁরা ভুলে গেছেন, পাবার আশায় তাঁদের চোখমুখ ঝলমল করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে। মুক্ত বাংলা দুঃখী মানুষেব জন্যে নিয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের অংগীকার, নির্বাক মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি। রাজপথ থেকে মঞ্চ পর্যন্ত মানুষেব মাঝ দিয়ে বংগবন্ধু আসবেন। দু'ধারে মানুষের সারি।

একটি মালা হাতে ইতি দাঁড়িয়ে আছে। ভোর হতেই জলিকে বলেছিলো: তুইতো যাবিনে। জানি তুই রেডিওর পাশে বসে একাকী শুনবি। কিন্তু আমি যাবো। আমি দেখবো।

জলি তার স্বভাবসিদ্ধ নির্লিপ্ত হাসিটি ঠোঁটের প্রান্তে এনে বলেছিলো: না আমি যাবো না, দেখবো না। আমি শুধু শুনবো।

ইতি এসেছে। সাথে নিয়ে এসেছে তার কলেজের ছাত্রীদের। প্রত্যেকের হাতে মালা। এমনি এসেছে অনেকে; কারো হাতে মালা, কারো হাতে ফুল। অজস্র ফুলের পাপড়ি।

৪টা ২৫ মিনিটে লাল নীল কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া ট্রাকটি বংগবন্ধুকে নিয়ে রেস্ কোর্সের ময়দানে ঢুকলো। শুরু হলো গগন-বিদারী শ্লোগান। করতালি, লক্ষ লক্ষ লোকের উল্লাস। ভীড় ঠেলে অতিকষ্টে ট্রাকটি এসে থামলো মঞ্চের পাশে। বংগবন্ধু উঠে এলেন মঞ্চে। শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো শান্ত আকাশ, আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লো লক্ষ লক্ষ মন। বাংলার মহানায়ক ধীর পদক্ষেপে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সুদীর্ঘ নয় মাসের অসহ্য কারা-যন্ত্রণায় কৃশকায় হয়ে গেছেন। কিন্তু কণ্ঠে রয়েছে তেমনি আগের মতো বজ্রের কাঠিন্য আর দরদী সুরের স্পর্শ।

"The Titan looks as ever, firm, not proud."

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর বিয়োগ-ব্যথায় তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে বারবার কেঁপে উঠছে। তার দু'চোখের কোণ বেয়ে মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল। আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বলছেন: "আমার জীবনের স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত স্বাধীন। ইয়াহিয়ার কারাগারে আমি মরতে প্রস্তুত ছিলাম। কারণ আমি জানতাম আমার বাংলার মানুষ মুক্ত হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশে স্বাধীনতার জন্যে মানুষকে এত প্রাণবলি দিতে হয়নি। আমি জানতাম তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার একটা প্রার্থনাই ছিলো—তোমরা আমার মৃতদেহটি আমার সোনার বাংলায় পাঠিয়ে দিও।

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে আমি ভারতের জনগণ, ভারত সরকার এবং শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

"বাংলাদেশ আজ এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলা দেশ চিরদিন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে।...... স্বাধীনতার জন্যে বাংলাদেশের মানুষেরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন,

যে কোরবানী দিয়েছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তার নজীর নেই। বাংগালীদের মতো কোন জাতিকে এত বেশী রক্ত দিতে হয়নি। কিন্তু এত ত্যাগ তিতিক্ষার পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তা অর্থহীন হয়ে যাবে যদি দেশের অগণিত মানুষকে খাবার, থাকার আশ্রয় ও পরনের বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা না হয়। আজ থেকে আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য দু'বেলা খাবার, থাকার আশ্রয় এবং সুন্দর জীবনের ব্যবস্থা করা।······বাংলাদেশ কোনো একটি বিশেষ ধর্মের আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করা হয়নি। এর আদর্শ হচ্ছে ধর্ম-নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। পশ্চিম পাকিস্তানীরা অসংখ্য বাংগালীকে হত্যা করেছে, অসংখ্য বাংগালী মা-বোনকে বেইজ্জত করেছে ; তবু আমি চাই তারা ভালো থাকুক। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তির পর আসার কালে, ভুট্টো সাহেব বলেছিলেন, পাকিস্তানের সংগে কোন প্রকার ঢিলেঢালা সম্পর্ক রাখা সম্ভব কি-না, তার চেষ্টা করতে। আমি বলেছিলাম, আমি আমার লোকদের কাছে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত কিছুই বলতে পারবো না। আমি এখন চাই ভুট্টো সাহেব সুখে থাকুন, পশ্চিম পাকিস্তান শ্রীবৃদ্ধি-লাভ করুক। কিন্তু তাঁরা যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করেন। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছে, সে সম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার জন্যে আমি জাতিসংঘের কাছে অনুরোধ জানাই। আমি সালাম জানাই মুক্তিবাহিনীকে, গেরিলা-বাহিনীকে, কর্মীবাহিনীকে। আমি সালাম জানাই সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীকে, কৃষক ভাইদের, বুদ্ধিজীবীদের।"

বংগবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছেন। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন। সভামঞ্চের ওপর বসে পড়েছেন তিনি। তাঁকে এখন

আর সভামঞ্চের নীচে থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবু লক্ষ লক্ষ জনতা করতালি দিয়ে, হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দিত করছেন। বিকেলের মিষ্টি রোদে হেসে উঠেছে বাংলার আকাশ। হাসছে সন্তানহারা মা। পিতৃ-মাতৃহারা সন্তানের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। হাসছে স্বামীহারা বধূ আর লাঞ্ছিতা বাংলার অযুত নারী। মহানায়ককে ফিরে পেয়ে তারা এক নোতুন জীবনের স্বপ্নে, সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে হাসছে। আর বাংলার মহানায়ক শেখ মুজিব, তিনি বসে আছেন সভামঞ্চের ওপর। তাঁর দু'চোখ থেকে অবিরল-ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মহানায়ক ছোট্ট শিশুটির মতো কাঁদছেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নিপীড়িত নিঃস্ব বংলার মানুষের জন্যে, তাঁর হারানো সাথীদের জন্যে।